াপুরে (বাজাসন বিহারের ভগ্নাবশেষ সংলগ্ন) মৃত্তিকা খননে প্রাপ্ত
বৌদ্ধযুগের "বাসুদেব মূর্ত্তি।"
ইদানিং রোয়াইল গ্রামে গাছতলায় স্থাপিত আছেন।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা]　　[অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ সাল ।

ভারতের আহ্বান

[শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ]

ভারতের যে বাণী—সে বাণী সমস্ত পৃথিবীর। ভারতে যে নবীন জাতি গড়ে উঠছে, তারা সে বাণী পৃথিবীর মধ্যে প্রচার করবে—তার জন্য ভারতের ইতিহাস অপেক্ষা করছে, তার জন্য যুগশঙ্খ বেজে উঠেছে। তারি জন্য বুঝি স্পষ্ট করে দেখতে পাবে কি না পাবে সকলে আজ ছুটে আসছে। আমাকে ভারতের ইতিহাস ডেকেছে। যুগশঙ্খ বেজে উঠেছে—সে শঙ্খধ্বনি তোমার প্রাণকে স্পর্শ করেছে, তাই তুমি ছুটে এসেছ। আমি কেহ নই। আমি কে? আজ আমি সামান্য কর্ম্মীমাত্র—তোমাদের সেবক,—তার বেশী অহঙ্কার আমার নাই। তোমাদের সেবায়—আমার স্বদেশবাসীর সেবায়—আমি আজ কর্ম্মে নিযুক্ত। কাল হয়ত ভগবৎ কৃপায় -এমন অবস্থা হবে——আমি আর সে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকতে পারবো না। আমাকে এখনই হয়ত তিনি অন্য কোন জায়গায় সরিয়ে নেবেন; নয়ত আমাকে মরণের দেশে যেতে হবে।

এই যুগধ্বনি তোমাদের প্রাণে বেজেছে! একবার ধ্যান কর—একবার চোখ বুজে মনের মধ্যে চক্ষুকে তাড়িত কর—দৃষ্টিকে পাতিত কর, তখন দেখতে পাবে কি? দেখতে পাবে শুনতে পাবে কি? যা দেখবে তাই শুনতেও পাবে। মনের মধ্যে যে স্বাধীনতার আলোক ধীরে ধীরে জ্বলে উঠছে—সেটা দেখবার জিনিষ -সেটা শুনবার জিনিষ—সেটা বুঝবার জিনিষ।

ইন্দ্রিয়ের ভোগ সেখানে নাই। সেখানে তোমাদের দেখা, শোনা, আস্বাদ-করা, পান করা সব এক কথা। সেখানে এই পঞ্চেন্দ্রিয় এক,—একই আধার সে কি? মুক্তি। সে কি? ধ্যান। সে সব—সে সন্ধ্যার মন্ত্র, জীবনের সব। সেটা দেখতে হবে, দেখতেই হবে, কেউ কারো ছেড়ে নয়। আজ যে ঘৃণা করে, মানুষকে বঞ্চিত করে বলে সব বাতুল—কাল তাকেও আসতে হবে। যুগ শঙ্খ বেজেছে। এযুগে ভারতে এমন নরনারী থাকতে পারে না যে বিধাতার যুগশঙ্খ ধ্বনি প্রত্যাখ্যান করবে। তাকে শুনতে:হবে—আজ না হয় কাল। লীলাময়ের সময়ের ত অন্ত নাই। আজ না হয় দু'দিন পরে শুনতে হবে—দেখতে হবে ওরূপ দেখতে হবে! মনকে বাঁধতে হবে, মনের সেতার ঐ সুরে বাঁধতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। এই যে প্রেমের বন্যা—এতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কে ছুটবে বল। যদি আমি প্রাণ দিতে পারি-কে ছুটবে বল। বিশ্ব আর তাকে কি আবদ্ধ করতে পারবে। বিধাতা যদি সে প্রেম আমার হৃদয়ে দেন, আমি যদি সে প্রেম ঢেলে দিতে পারি, যতই যুক্তি কর, তর্ককর—থাকতে পারবেনা। পথে বেরুতে হবে। দেখতে পারছনা ভগবানের দুই বাহু সমস্ত দেশকে ঘিরে রেখেছে। দেখতে পারছনা?—চোখ খোল—অন্ধের মত থেকনা! ধ্যানে শুনতে পাওনা? দৃষ্টিহীন, সাধনাবিহীন চোখ বুঝে ভগবানের কৃপাভিক্ষা কর। দিনের পর দিন যুক্তি তর্কের মধ্যে বদ্ধ-জীবের মত আবদ্ধ থেকনা। মনটিকে খুলে দাও—আকাশ বাতাসের স্পর্শ নেও। সাধনাতে স্পর্শ কর। দেখবে সব বন্ধন টুটে যাবে। একথা আমি অহঙ্কার করে বলছিনা। আমার কিছুই নাই। ভগবৎ প্রসাদে একথা বলবার অধিকার ভগবানই আমাকে দিয়েছেন। আমার আর বাহ্যিক কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা নাই।

যে স্বাধীনতার বাণী ভগবৎ কৃপায় আমি শুনেছি—তাতে নিজকে স্বাধীন করেছি—আমার স্বরাজ আমি পেয়েছি। ভাইরে; মনে করোনা আমি অহঙ্কার করে বলছি। যদি অহঙ্কার করে বলি—তবে আমার মাথা তোমার পায়ে ছোঁয়াই। আমি অবনত মস্তকে তোমার পায়ের স্পর্শ নেব।

আজ আমার মনে যে ভাবের উদয় হচ্ছে সেইটাই আমি বলছি। ইচ্ছা করে আমার সমস্ত ভাইদের দুই হাত আমার বুকের উপর রেখে সেই অনুভূতি তাদের দিই। সত্য মিথ্যার কথা বলছি না। আমি স্বরাজ পেয়েছি—আমার ভাবনা নাই—ভয় নাই। আমি যতদিন পর্য্যন্ত বাংলা দেশে এই স্বরাজের

আকাঙ্ক্ষা বাংলার সমস্ত নর-নারীর হৃদয়ে জাগাতে না পারি ততদিন—আমার বিশ্রাম নাই—আমার বিরাম নাই। এ কাজ করতে হবে। যদি আমি অক্ষম হই—বিধাতার ইচ্ছায় যদি আমার চেয়ে আর কেহ বেশী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, আমি সরে যাব। আমি মাটিতে শুয়ে থেকে ধুলায় লুণ্ঠিত হব। কিন্তু ধুলায় লুণ্ঠিত হয়ে চরণ স্পর্শ করে যতদিন পর্য্যন্ত না এই স্বরাজের স্বাধীনতার বার্ত্তা দেশে আমার ভাই বোনদের মনে না জাগাতে পারব ততদিন আমার বিরাম নাই।

শিক্ষার বিরোধ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

এতদিন এদেশে শিক্ষার ধারা একটা নির্ব্বিঘ্নে নিরুপদ্রবে চলে আস্‌ছিল। সেটা ভাল কি মন্দ এ বিষয়ে কারও কোন উদ্বেগ ছিলনা। আমার বাবা যা পড়ে গেছেন, তা' আমিও পড়্‌ব। এর থেকে তিঁনিও যখন দু'পয়সা করে গেছেন, সাহেব-সুবোর দরবারে চৌয়ারে বস্‌তে পেয়েছেন, হ্যাণ্ড-শেক করতে পেয়েছেন, তখন আমিই না কেন পারব? মোটামুটি এই ছিল দেশের চিন্তার পদ্ধতি! হঠাৎ একটা ভীষণ ঝড় এল! কিছুদিন ধরে সমস্ত শিক্ষা-বিধানটাই বনিয়াদ সমেত এম্‌নি টলমল করতে লাগল যে, একদল বললেন পড়ে যাবে। অন্যদল সভয়ে মাথা নেড়ে বললেন না, ভয় নেই—পড়বে না। পড়লও না। এই নিয়ে প্রতিপক্ষকে তাঁরা কটু কথায় জর্জ্জরিত করে দিলেন। তার হেতু ছিল। মানুষের শক্তি যত কমে আসে মুখের বিষ তত উগ্র হয়ে ওঠে। বাইরে গাল তাঁরা ঢের দিলেন, কিন্তু অন্তরে ভরসা বিশেষ পেলেন না। ভয় তাঁদের মনের মধ্যেই রয়েই গেল দৈবাৎ বাতাসে যদি আবার কোনদিন জোর ধরে ত এই গোড়া-হেলা নড়বড়ে অতিকায়টা হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়তে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবে না।

এম্‌নি যখন অবস্থা তখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফিরে এলেন, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে উপর্য্যুপরি কয়েকটা বক্তৃতায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল্য পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবলি ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমাত্র আঘাত করে বসি। কিন্তু এতো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনা নয়,—যা তাঁরও বহু পূজ্য,—সেই দেশের সঙ্গে এ বিজড়িত। তাঁর কথা নিয়ে কয়েকটা অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান কাগজ একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে তাদের প্যাঁচালো উপদেশের আর বিরাম নেই। আর কিছু না হোক, দেশের হিতাকাঙ্ক্ষায় এদের যখন বুক ফাট্‌তে থাকে তখনি ভয় হয়, ভেতরে কোথাও একটা বড় রকমের গলদ আছে। বিশেষ করে বাঙ্গালী পরিচালিত একখানা Anglo Indian কাগজ। এর মুখের ত আর কামাই নেই। নিজের বুদ্ধি দিয়ে কবির কথাগুলো বিকৃত বিধ্বস্ত করে অবিশ্রাম বলচে— আমরা বলে বলে গলা ভেঙে ফেলেচি, ফল হয়নি,—এখন রবিবাবু এসে রক্ষে করে দিলেন। যথা—And if there were any among educated Bengalees who were wavering and vacillating, knowing not what to do—to exclude the West or to stick to the East— Rabindranath's recent Calcutta lectures have gone a great way towards making up their minds. They have given up their sitting-on the-fence posture. They have jumped off on the Western side. অর্থাৎ আমরা দেশের শিক্ষিত সমাজ বেড়ার ডগায় বসেছিলাম, পশ্চিমপ্রত্যাগত কবির ইঙ্গিতে 'জয়রাম'! বলে পশ্চিম দিকেই লাফিয়ে পড়লাম! বাঁচা গেল! শিক্ষিত সমাজের এতদিনে একটা কিনারা হ'ল! কিন্তু শিক্ষিতের দল যা' নিয়ে এত বড় রই-রাই করেন, যাদের অশিক্ষিত অজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন না,—তাঁদের যুক্তি তর্কে এর কি মূল্য দাঁড়ায় একবার সেটাও ওজন করা ভাল! কিন্তু মোটের উপর পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলনে আসল কথা কবি কি বলেছেন?

প্রথম কথা বলেছেন এই যে, আজকের দিনে পশ্চিম জয়ী হয়েচে সুতরাং সেই জয়ের কৌশলটা তাদের কাছে আমাদের শেখা চাই। বেশ। দ্বিতীয় কথা, লড়াইয়ের পরে পশ্চিম শোকাকুল হয়ে জিজ্ঞেসা করছে 'ভারতের বাণী কই'?' অতএব তাদের সেটা বলে দেওয়া আবশ্যক। এও ভাল কথা। আমি যতদূর জানি অসহযোগ পন্থীর কেউ এ বিষয়ে কোন আপত্তি করে না।

তৃতীয় দফায় কবি উপনিষদের ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং, অতএব মাগৃধঃ। চমৎকার কথা,—কারও কোন স্বত্ব নেই। এযে একটা তত্ত্ব নয়, সমস্ত দুনিয়ায় এও কেউ লোক সমাজে স্বীকার করে না। অথচ, মানুষের এমনি পোড়া স্বভাব যে সে সরল ও সহজ সত্য কিছুতেই সোজা করে বলে মিটিয়ে নেবে না। আপন আপন স্বার্থ ও প্রয়োজন মত, তার মধ্যে অসংখ্য sub clause, অগণিত qualificationএর আমদানি করে তাকে এমনি ভারাক্রান্ত করে তুলবে যে তত্ত্বকথা আপনি হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়াবে। তখন অসঙ্কোচে তাকে সত্য বলে চিনে নেওয়াই কঠিন। শুধু এই জন্যই উপস্থিত fact গুলোই সংসারে সত্যের মুখোস পরে মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তার ধারার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করে অপরিমেয় অনর্থের সূচনা করে দেয়।

কবি প্রথমেই বলেচেন, "এ কথা মান্‌তেই হবে যে আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েচে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করেছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। ....অধিকার ওরা কেন পেয়েচে? নিশ্চয়ই সে কোন একটা সত্যের জোর।"

আজকের দিনে এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে পৃথিবীর বড় বড় ক্ষীর ভাণ্ডেই যে মুখ জুবড়ে আছে,—তার পেট ভরে দুই কস বয়ে দুধের ধারা নেমেছে,—কিন্তু আমরা উপবাসী দাঁড়িয়ে আছি।

এ একটা fact; আজকের দিনে একে কিছুতেই না বলবার পথ নেই,—আমরা উপবাসী রয়েছি সত্যই কিন্তু তাই বলেই কি এ কথা মানতেই হবে যে, এ অধিকার পেয়েছে তারা নিশ্চই একটা সত্যের জোরে! এবং এই সত্য তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতেই হবে! লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে, এক একটা fact, কিন্তু একেই যদি মানুষে চরম সত্য মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকত ত আজকের দিনে নীচে জলের উপর এবং উর্দ্ধে আকাশের মধ্যে লোহার জাহাজ ছুটে বেড়াতে পারত না। উপস্থিত কালে যা fact তাই কেবল শেষ কথা নয়। মাসের ১লা তারিখে সে লোকটা তার বিদ্যের জোরে আমার সারা মাসের মাইনে গাঁট কেটে নিয়ে ছেলেপুলে সমেত আমাকে অনাহারে রাখলে, কিম্বা মাথায় একটা বাড়ি মেরে সমস্ত কেড়ে নিয়ে রাস্তার ওপরে চাটের দোকানে বসে ভোজ লাগালে—এ ঘটনা সত্য হলেও কোন সত্য অধিকারে বলতে পারব না কিসে এ দুটো মহাবিদ্যে শেখবার জন্যে

তাদের শরণাপন্ন হতে হবে এও স্বীকার করতে পারব না। তা ছাড়া গাঁট-কাটা কিছুতেই বলে দেবে না পয়সা কোথায় রাখলে কেটে নেওয়া যায় না, অথবা ঠেঙালেও শিখিয়ে দেবে না কি কোরে তার মাথায় উল্টে লাঠি মেরে আত্মরক্ষা করা যায়। এ যদি বা শিখতেই হয়, ত সে অন্য কোথাও—অন্ততঃ তাদের কাছে নয়। কবি জোর দিয়ে বলেছেন, এ কথা মানতেই হবে পশ্চিম জয়ী হয়েছে এবং সে শুধু তাদের সত্য বিদ্যার অধিকারে হয়ত মানতেই হবে তাই। কারণ সম্প্রতি সেই রকমই দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেচে বলে এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্য বিদ্যা, অতএব শেখা চাইই এ কথা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না। গ্রীস একদিন পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার লুটে নিয়ে গিয়েছিল রোমও তাই করেছিল। আফগানেরাও বড় কম করে নি,—কিন্তু সেটা সত্যের জোরেও নয়, সত্য হয়েও থাকে নি। দুর্য্যোধন একদিন শকুনির বিদ্যার জোরে জয়ী হয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে দীর্ঘকাল ধরে বনে-জঙ্গলে উপবাস করতে বাধ্য করেছিল, সেদিন দুর্য্যোধনের পাত্রও ছাপিয়ে গিয়েছিল, তার ভোগের অন্নে কোথাও একটি তিলও কম পড়ে নি কিন্তু তাকেই সত্য বলে মেনে নিলে যুধিষ্ঠিরকে ফিরে এসে সারাজীবন কেবল পাশা খেলা শিখেই কাটাতে হোতো। সুতরাং সংসারে জয় করা বা পরের কেড়ে নেওয়ার বিদ্যাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই মানুষের বড় সার্থকতা নয়। তা ছাড়া জয় কি কেবল নির্ভর করে বিজেতার উপরেই? আফগান যখন হিন্দুস্থান জয় করেছিল, সে কি তার নিজের গুণে? হিন্দুস্থান দেশ হারিয়েছিল তার নিজের দোষে। সেই ত্রুটি সংশোধন করার বিদ্যে তার নিজের মধ্যেই ছিল, বিজেতা আফ্‌গানের কাছে শেখ্‌বার কিছুই ছিল না। আবার এমন দৃষ্টান্তও ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য নয় যখন বিজেতাই পরাজিতের কাছে কি বিদ্যা, কি ধর্ম্ম, কি সভ্যতা, কি ভদ্রতা সমস্তই শিক্ষা করে আর একদিন মানুষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কে বলেচে সত্যকার বিদ্যা যদি কিছু তার থাকে তা শিখতে হবে না? কে বলেচে তার দ্বার পশ্চিমমুখো থাকায় তাকে অহিন্দু বলে বয়কট করতে হবে? কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়নশাস্ত্র, কি ধনবিজ্ঞান—এ সকল পশ্চিমে বিদ্যে। শেখ্‌বার আবশ্যক নেই বলে কে বিবাদ করেচে? বিবাদ যদি কিছু থাকে সে তার বিদ্যার উপরে নয়—সে তার শেখানোর ভাণ করার ওপর। শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার আয়তনের ওপর। এতকাল এই তামাসায় যোগ দিয়ে পাগলের মত সবাই নেচে

বেড়াচ্ছিল, এখন হঠাৎ জন কয়েক লোকের চৈতন্য হওয়ায় তারা পেছিয়ে দাঁড়িয়ে এই ফাঁকিটাকে কেবল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেচে—এই ত দোষ আসলে মত ভেদের কারণ।

এই বস্তুটাকেই একটু বিশেষ করে দেখ্‌বার চেষ্টা করা যাক্‌। পশ্চিমের পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র যতখানি বেড়ে উঠেছে গত যুদ্ধের সময় এতখানি এইটুকু সময়ের মধ্যে বোধ করি আর কখনো হয়নি। মানুষ মারবার নব নব কৌশল এরা যত আবিষ্কার করেছে ততই আনন্দে দম্ভে এদের বুক ভ'রে উঠেচে। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আগুন দিয়ে বিষ দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামকে গ্রাম সহরকে সহর ধ্বংস করবার কত ফন্দিই না এরা বা'র করেচে এবং আরও কত বার করত এই যুদ্ধটা আরও কিছু দিন অগ্রসর হ'লে। সৌভাগ্য এবং সভ্যতার বোধ করি এদের এই একটীমাত্র মাপকাঠি কে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটেই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। এ যে দেখ্‌তে না পায় সে অন্ধ এবং এই বিদ্যাটা অপরকে এরা শিখাতে পারে কিম্বা শেখাবার সুযোগ দিতে পারে অতি বড় কবি-কল্পনাতেও এ আমি ভাবতে পারি না। কথা উঠতে পারে মানবের কল্যাণকর এমন কি কিছুই এর থেকে আবিষ্কৃত হয় নি? হয়েছে বই কি। কিন্তু সে নিতান্তই by-productএর মত। বলা যেতে পারে, হ'ক by-product কিন্তু সে যখন মানবের হিতার্থে তখন সেই বিদ্যাগুলো আয়ত্ত ক'রেও ত আমরা মানুষ হতে পারি? হয়ত পারি। কিন্তু ঠিক ও উপায়ে নয়। পশ্চিমের সভ্যতার অহঙ্কার অভ্রভেদী। আমাদের এবং আমাদের মত আরও অনেক দুর্ভাগা জাতির কাঁধে যখনই ওরা চেপে থাকে তখনই ঘরে বাইরে এই কৈফিয়ৎ দেয় যে এগুলো দেখতে শুন্‌তে মানুষের মত হ'লেও ঠিক মানুষ নয়। অন্ততঃ সাবালক মানুষ নয়, ছেলে মানুষ। বেল্‌জিয়ম্ যখন রবারের জন্য নিগ্রোদের দেশে গিয়ে নিগ্রোদেরই হাত কেটে দিত তখনও এই অজুহাতই তারা দিয়েছিল যে এরা আমাদের হুকুম মান্‌তে চায় না। এরা অসভ্য! অতএব আমরা গায়ে প'ড়ে এদের সুসভ্য কর্‌বার মানুষ কর্‌বার ভার যখন নিয়েছি তখন মানুষ এদের কর্‌তেই হবে। অতএব শিক্ষার জন্যে এদের কঠোর শাস্তি দেওয়া একান্তই আবশ্যক। অবশ্য ওখাপ্প বলা ছাড়া ওর যে আর কি জবাব আছে আমি জানি না। আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীর সম্পর্কে প্রশ্ন উঠ্‌লেও ইংরাজ ঠিক এই

জবাবটাই দিয়ে আসচে যে এরা অৰ্দ্ধ সভ্য—ছেলে মানুষ। এদের দেশে প্রচুর অন্ন, কিন্তু পাছে অবোধ শিশুর মত বেশী খেয়ে পীড়িত হয়ে পড়ে তাই এদের মুখের গ্রাস নিজেদের দেশে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—সে এদেরই ভালোর জন্যে। আবার টাকা কড়িগুলো পাছে অপব্যয় করে নষ্ট করে ফেলে তাই সে সমস্তও দয়া করে আমরাই খরচ করে দিচ্ছি; সেও এদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত। এমনি সব ভাল করার কত কি অফুরন্ত কাহিনী ডেকে হেঁকে প্রচার করচেন—কত কষ্ট করে সাত সমুদ্র তেরনদী পার হ'য়ে এদের মানুষ করতে এসেছি;—কারণ মানুষ করার sacred duty যে আমাদেরই ওপরে কিন্তু আঃ—গেলাম! by law established হ'য়ে এই ইণ্ডিয়ান গুলোকে মানুষ করতে করতেই হয়রান হয়ে গেলাম।

ভগবান জানেন্ কবে আমরা মানুষ হয়ে এদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করতে পারব! দেড়শ বছর ধরে তালিম দেওয়া চল্‌ছে কিন্তু মানুষ আর হলাম না। কবে যে হ'তে পারব সেও ওঁরাই জানেন আর জগদীশ্বর জানেন! কিন্তু ঐ দেড়শ বছরেও যদি ওই মোহ আমাদের ঘুচে না থাকে যে এদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সত্যিই একদিন মানুষ হয়ে উঠ্‌ব, সত্যি সত্যিই আমাদের মানুষ করে, নিজেদের মৃত্যুবাণ স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে তুলিয়া দিতে এরা ব্যাকুল, তা, হলে আমি বলি আমাদের কোন কালে মানুষ না হওয়াই উচিত! ভগবান যেন কোন দিন এই দুর্ভাগাদের পরে প্রসন্ন না হন।

বস্তুতঃ, একথা বোঝা কি এতই কঠিন যে, বিজ্ঞানের যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করে সেও মানুষ, অতএব স্বদেশের দায়িত্ব শুধু তারই আর কারও নয়,—পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে? তার বিদ্যালয় তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্ব্বনাশের জন্যেই তৈরি করিয়ে দেবে? সে কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য অভিনয় করতে উকীল মোক্তার মুনসেফ; হুকুম মতে জেলে দিতে ডেপুটি সবডেপুটি; ধ'রে আন্‌তে থানার ছোট বড় পিয়াদা; ইস্কুলে ভুবালের পিতৃভক্তির গল্প পড়াতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মাষ্টার; কলেজে ভারতের হীনতা ও বর্ব্বরতার লেক্‌চার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসার, আফিসের খাতা লিখিতে জীর্ণ শীর্ণ কেরাণী,—তার শিক্ষা বিধান এর বেশি দিতে পারে এও যে আশা করতে পারে সে যে পারে না

কি আমি তাই শুধু ভাবি। অথচ কবি বলেছেন বাঁচবার বিদ্যা, কিম্বা মানুষ হবার বিদ্যা আছে কেবল, শুক্রাচার্য্যের হাতে আজ তাঁর বাড়ী পশ্চিমে। সুতরাং মানুষ হ'তে যদি চাই তার আশ্রমে আজ আমাদের দৌড়তেই হবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। অমৃত-লোকের লোক হ'য়েও কচকে তার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হয়েছিল। হয়েছিল সত্য কিন্তু বিদ্যা ত কচ সহজে আদায় করতে পারেনি, গুরুদেবের ভোজ্য পদার্থ পর্য্যন্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু দিনকাল এখন বদলে গেছে,—আমাদের দুরদৃষ্টে যদি গুরুদেবের ভোজনপর্ব্ব পর্য্যন্ত হয়েই নাটক সমাপ্ত হয়ে যায়, তামাসার বাকী আর কিছু থাকবে না।

কিন্তু আমাদেরই বা এত দুঃখ, এত বেদনা কেন? কবি বলেছেন, সেটা একেবারে নিছক আমাদের নিজেরই অপরাধ। আমি কিন্তু এই উক্তিটাকে পুরোপুরি স্বীকার করতে পারিনে। আমার মনে হয় প্রত্যেক মানব জীবনের দুঃখের অধ্যায়েই তার অপরাধ ছাড়াও একটা জিনিস্ আছে যা' তার অদৃষ্ট। যে বস্তু তার দৃষ্টির বাইরে, এবং যার ওপর তার কোন হাত নেই। তেম্নি একটা সমগ্র জাতিরও দুঃখের মূলে তার দোষ ছাড়াও এমন বস্তু আছে যা তার সাধ্যের অতীত, যা' তার দুর্ভাগ্য। আমাদের দেশের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা বোধ হয় সম্পূর্ণ অসত্য বলে এ কথা উড়িয়ে দেবেন না দুঃখ ও হীনতার মূলে আমাদের অদৃষ্ট-বস্তুও অনেকটা দায়ী। যার ওপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু কবি একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করে উপমাচ্ছলে একটা গল্প বলেছেন। গল্পটা এই—

মনে কর এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মটর হাকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে তার কৌতুহলের অন্ত নেই! সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কি করে? অন্য ছেলেটি ভাল মানুষ সে ভক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তাঁর দুই হাত মোটরের হাল যে কোন দিকে কেমন করে ঘোরাচ্চে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালক ছেলেটি মোটরের কল কারখানা পুরোপুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে উর্দ্ধস্বরে বাঁশি বাজিয়ে দৌড় মারলে। গাড়ী চালাবার সখ দিন রাত এমনি তাকে পেয়ে বসল যে বাপ আছেন কি নেই সে হুঁস তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়ীটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং

যে রথের রথী ছেলেও যে সেই রথের রথী এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালমানুষ ছেলেটি দেখলে ভায়াটি তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ড ভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়া গাড়ী চালিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে রাখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে মরণং ধ্রুবং—তখনও সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, আর বললে আমার আর কিছুতে দরকার নেই।

এই গল্পের সার্থকতা যে কি আমি বুঝতে পারিনি। ছেলে দুটি কে তা অনুমান করা শক্ত নয়; কিন্তু এক ছেলের প্রতি আর এক ছেলের অকারণ দৌরাত্ম্য দেখে যে বাপ প্রসন্ন, তিনি যে কিরূপ বাপ তা' বোঝা যায় না। তবে একথা বেশ বোঝা যায় এমন বাপের পায়ের দিকে যে ছেলে তাকিয়ে থাকে, তা' তিনি যত বড় রথেরই রথী হোন্ তার মরণং ধ্রুবং।

অতঃপর কবি এই দুটি ছেলের জীবন বৃত্তান্তও দিয়েছেন। মটর-হাঁকানো ছেলেটি ত ম্যাজিক থেকে বিজ্ঞানের ক্লাশে প্রোমোশন পেলে, কিন্তু যে ছেলেটির মরণং ধ্রুবং সে তার ম্যাজিক ও তন্ত্র মন্ত্র নিয়েই পড়ে রইল। এই তন্ত্র মন্ত্রের পরে কঠোর কটাক্ষ কবি পূর্ব্বেও করেছেন। তাঁর অচলায়তনে এ নিয়ে হাসি-তামাসা অনেক হয়ে গেছে, যারা ওয়াকিফ-হাল তাঁরা এর মীমাংসা করবেন কিন্তু আমার মনে হয় এখানে এ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

বিশ্ব বস্তুর পিছনে যে কোন একটা অজ্ঞেয় শক্তি আছে, মানব ইতিহাসে এ একটা প্রাচীন তত্ত্ব। এবং আজ বিংশ শতাব্দীতেও কুল কিনারা তার তেম্‌নি অজ্ঞাত। সেই অজ্ঞেয় শক্তিকে প্রসন্ন করে কাজ আদায়ের চেষ্টা মানুষ চিরদিন করে আস্‌চে,—আজও তার উপায় বার হয়নি, অথচ আজও তার অবসান নেই। এই উপায় আবিষ্কারের পথে কি করে যে প্রার্থনা একদিন ম্যাজিক অর্থাৎ মন্ত্র তন্ত্রে, এবং ম্যাজিক আর একদিন প্রার্থনার চেহারা বদলে দাঁড়ায় এ তর্ক তুলে পুঁথি বাড়াতে আমার সাধ নেই। ঈশ্বরের ধারণার অভিব্যক্তির ইতিহাসের এই অংশটা বি ানের পরিণতির প্রশ্নে আমার অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।

সে যাই হোক, এই মটর-হাঁকানো ছেলেটির উন্নতির হেতুবাদ এবং সেই পায়ের-দিকে-তাকানো ভালো ছেলেটির দুঃখের বিবরণ কবি এইখানে একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যথা—"পূর্ব্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকৃচি দৈন্য হলে গ্রহ শান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে

দৌড়াচ্ছি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্ছি শীতলাদেবীর পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ উচাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেছি, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম মহাদেশে ভলটেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'শুনেচি নাকি মন্ত্র গুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য ?' ভালটেয়ার জবাব দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায় কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।" য়ুরোপের কোন কোণে কানাচে যাদু মন্ত্রের পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। এই জন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে এবং আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।"

কবির এ অভিযোগ যদি সত্য হয় তা'হলে বলার আর কিছু নেই। আমাদের সব মরাই উচিত, এমন কি, সেকো বিষ খেতেও কারো আপত্তি করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু এই কি সত্য ? ভলটেয়ার বেশি দিনের লোক নন, তাঁর মত পণ্ডিত ও জ্ঞানী তখন সেদেশেও বড় সুলভ ছিল না, অতএব এ কথা তাঁর মুখে কিছুই অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তখনকার দিনে অজ্ঞান ও বর্ব্বরতায় কি এ দেশটা এতখানিই নীচের ধাপে নেবে গিয়েছিল যে ঠিক এম্‌নি কথা বলবার লোক এখানে কেউ ছিলনা ? কেউ ছিলনা যে বলে, ভুতের ওঝা না ডাকিয়ে বৈদ্যের বাড়ী যাও ? মারতে চাও ত অন্য পথ অবলম্বন কর, কেবল ঘরে বসে নিরালায় মারণ মন্ত্র জপ করলেই কার্য্য সিদ্ধ হবেনা ? য়ুরোপের জয়গান করতে আমি নিষেধ করিনে, কিম্বা যে হাতী দাঁকে পড়ে গেছে তাকে নিয়ে আস্ফালন করবারও আমার রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে ভুতের ওঝা ও মারণ উচ্চাটন মন্ত্রতন্ত্রের ইঙ্গিতেও নির্ব্বিবাদে হজম করতে পারিনে।' গোরা' বলে বাঙলা সাহিত্যে একখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ বই আছে ; কবি যদি একবার সেখানি পড়ে দেখেন ত দেখতে পাবেন তার একান্ত স্বদেশভক্ত গ্রন্থকার গোরার মুখ দিয়ে বলেছেন,—নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ, এবং স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে'

কবি বলেছেন, যাদুমন্ত্রের পরিণতিই হচ্ছে বিজ্ঞান। কোনও একটা বস্তু কত দিক থেকে যে পরিণত হয়ে ওঠে সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু এই কি ঠিক যে য়ুরোপ তার যাদু বিদ্যার নালা এক লাফে ডিঙিয়ে গেল, আর আমরা দেশ সুদ্ধ লোক মিলে ঘাড়-মোড়-ভেঙে সেই পাঁকেই চিরকাল পুতে রইলাম। বাইরের দিকে বস্তুবিশ্ব যে একটা প্রকাণ্ড কল, এর অখণ্ড, অব্যাহত নিয়মের শৃঙ্খল যে

যাহ বিদ্যায় ভাঙেনা, সংসারে যা-কিছু ঘটে—তারই একটা হেতু আছে এবং সেই হেতু কঠোর আইন কানুনে বাধা, অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ জনক-জননী বিশ্ব জগতে কার্য্যকারণের সত্য ও নিত্য সম্বন্ধের ধারণা কি এই দুর্ভাগ্য পূর্ব্বদেশে কারও ছিলনা? এবং এই তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা কি পশ্চিম হ'তে আমদানী না করতে পারলে আমাদের ভাগ্যে মারণ-উচাটন মন্ত্র-তন্ত্রের বেশী আর কিছুই মিলতে পারে না? পশ্চিমের বিদ্যার অনেক গুণ থাকতে পারে কিন্তু সে যদি আমাদের নিজেদের প্রতি কেবল অনাস্থাই এনে দিয়ে থাকে, আমাদের জ্ঞান, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ সংস্থান, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি সকলের প্রতি যদি শুধু অশ্রদ্ধাই জন্মিয়ে দিয়ে থাকে ত মনে হয় লুব্ধচিত্তে পশ্চিমের শুক্রাচার্য্যের পানে আমাদের না তাকানোই ভাল। বস্তুতঃ, এই ত নাস্তিকতা। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, যে শিক্ষায় মানুষ সত্যকারের মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে—অন্ততঃ তাদের মানুষের ধারণা যা, তা তারা আমাদের দেয় নি দেবে না এবং আমার বিশ্বাস দিতে পারেও না। এই সুদীর্ঘকাল পশ্চিমের সংসর্গেরও যে আমরা কি হয়ে আছি মাত্র সেইটুকুই কি এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নয়? পেয়েছি কেবলই এই শিক্ষা—যাতে নিজেদের সর্ব্ব বিষয়ে অবজ্ঞা এবং তাদের যা কিছু সমস্তের পরেই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গেছে। আর তাদের ভিতরের দ্বার এমন অবরুদ্ধ বলেই অবনতিও আজ আমাদের গভীর। সেটা জান্‌বার পথ নেই, তাই শুধু তাদের বাহিরের সাজ-সজ্জা দেখে একদিকে নিজেদের প্রতি যেমন ঘৃণা অন্য দিকে তাদের প্রতিও ভক্তির আবেগ একেবারে শতধারে উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে। তাই একদিন আমাদের দেশের একদল লোক নির্ব্বিচারে ঠিক করেছিলেন, ঠিক ওদের মত না হতে পারলে আর আমাদের মুক্তি নেই। ওদের জাতিভেদ নেই অতএব সেটা ঘোচানো চাই, ওদের স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—অতএব সেটা না হ'লেই নয়, তাদের খাওয়া দাওয়া বাচ-বিচার নেই সুতরাং ওটা না তুললেই আর রক্ষে নেই, তাদের মন্দির নেই, অতএব আমাদেরও গির্জ্জার ব্যবস্থা চাই, তারা ভাড়া ক'রে ধর্ম্মপ্রচারক রাখে সুতরাং আমাদেরও ওটা অত্যাবশ্যক—এমনি কত কি! কেবল গায়ের চামড়াটা বদলাবার ফন্দি তাঁরা খুঁজে পান নি, নইলে আজ তাঁদের চেনাও যেত না। অথচ, আমি এর দোষ গুণের বিচার করচি নে, আমি সরল চিত্তে বলছি, কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করবার আমার লেশমাত্র অভিরুচি নেই, আমি কেবল এর Mentalityটাই আপনাদের

গোচর করবার প্রয়াস করচি। এই যে বিদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও স্বদেশের প্রতি নিদারুণ বিরাগ এ শুধু সম্ভবপর হয়েছিল তাদের আনন্দের পথটা চিরদিন বন্ধ ছিল বলে। তাই এদের সংসর্গে যারা এসেছিলেন তাদের চোখে ওদের বাইরের মোহটা এমনি পেয়ে বসেছিল যে এ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে তাঁদের মুহূর্ত্ত বিলম্ব ঘটেনি যে বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যাচ্ছে কেবল সেই টুকুর হুবহু নকল করলেই তাঁরাও অমনি মানুষ হ'য়ে ওদের অন্দরে পংক্তিভোজনে সরাসর বসে খেতে পাবেন। সংসারে যা কিছু অজ্ঞাত, গোপন, যার ভিতরে প্রবেশের পথ নেই, তার প্রতি বাইরের লোকের লোভের অবধি থাকে না—একথা তাঁদের স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নিতে কোথাও কিছুমাত্র বাধে নি যে মানুষ হবার সত্যকার সঞ্জীব মন্ত্রটী কেবল ওদের ওই নিগূঢ় মর্ম্মস্থানটীতেই চাপা দেওয়া আছে, কোনমতে ওর সন্ধান না পেলে আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক করবার দ্বিতীয় পন্থা নেই! এই ভ্রান্তিটা চোখ মেলে দেখবার আজ দিন এসেছে।

শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে। সে শুধু দেহের গঠনে নয়, সে অন্তরের আত্মায়। এই যে শিক্ষার প্রণালী নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদ চলেছে—ওদের শিক্ষা অত্যন্ত মহার্ঘ্য, অত বড় বড় বাড়ী কি হবে? কি হ'বে টানা পাখায়? কাজ কি আমার টেবিল চেয়ারে,—দূর করে দাও মোটা মাইনের বিলিতি প্রফেসার—তার খরচ যোগাতেই যে দেশের বাপ-মা পাগল হ'য়ে গেল! এম্নি আরও কত শত। এর কোনটাই মিথ্যে নয়, কিন্তু এও আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়, যখন ভাবি পশ্চিম ও পূর্ব্বের শিক্ষার সংঘর্ষ ঠিক কোন খানে? এদের সত্য মিলনের যথার্থ অন্তরায় কোথায়? একি কেবল গোটাকতক সাজ গোজ বদলালেই হ'বে? টেবিল চেয়ারের বদলে লম্বা লম্বা মাদুর পেতে, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের পরিবর্ত্তে তালপাখা এনে, কিম্বা মোটা মাইনের প্রফেসারের বদলে রোগা মাইনের দিশি অধ্যাপক আমদানী ক'রে কিম্বা বড় জোর বিদেশী ভাষার মিডিয়মের স্থানে স্বদেশী ভাষায় লেকচারের আইন করলে দুঃখ দূর হ'বে? দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না যতক্ষণ সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না যাতে দেশের বহির্মুখী বীতশ্রদ্ধ মন আর একবার অন্তর্মুখী ও আত্মস্থ হয়। মনের মিলনই বা কি, আর শিক্ষার মিলনই বা কি, সে কেবল হ'তে পারে সমানে সমানে শ্রদ্ধার আদান-প্রদানে। এমন কাঙালের মত, ভিক্ষুকের মত কিছুতেই হবে না। হ'লেও সে শুধু একটা গোঁজা মিল হ'বে,—তাতে কল্যাণ

নেই, দেশকে সে কেবল হীনতা ও লাঞ্ছনাই দেবে, কোনদিন মনুষ্যত্ব দেবেনা।

অভয় মন্ত্র

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র]

লহ লহ লহ
অভয়ের মন্ত্রদীক্ষা লহ,
দিবসের কর্ম্মে তোর সারাদিনমান
যতেক সংসার ভয় ছায়ার সমান
অনুক্ষণ চলে পিছে পিছে,
যাক্ আজি যাক্ তাহা ঘুচে ;
লহ লহ লহ,
অভয়ের মন্ত্রদীক্ষা লহ।
ঘৃণা, লাজ, ভয়
নিমিষে হইবে সব ক্ষয়।
এ মন্ত্র জপিতে হবে সর্ব্বক্ষণ ধরি,,
এ মন্ত্রে জীবন তরে নিতে হবে বরি,
এ মন্ত্র আশ্রয়
জীবনের সর্ব্ব কর্ম্মে ছুটে যাবি নাহি কোন ভয়।
ঘৃণা, লাজ, ভয়!
কার ঘৃণা? কিসে লাজ? কারে তোর ভয়?
তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছতম ভয় করি তারে
অপমান করিস্না তাঁরে,
অন্তরে তোমার যিনি সর্ব্বক্ষণ ধরি
জাগিছেন অভয় বিতরি।

তাঁরি বলে বলীয়ান্ স । পথে ছুটে যেতে হবে,
মহাবীর কে তোরে রোধিবে ?
রোধিবে ঝঞ্ঝার বেগ ক্ষুদ্র পঙ্গপাল,
শুষ্ক তৃণরাশির জঞ্জাল ?
বিদ্যুতে করিবে রোধ চাতকের পাখা ?
শুষ্ক পর্ণ ঢাকা দিবে যজ্ঞানলশিখা ?
দীক্ষিত অভয় মন্ত্রে চলেছ নির্ভীক,
মহাসত্যে স্থিরমতি, সত্য পথে হে বীর পথিক,
তদেক শরণ—
শঙ্কা নাহি আসিলে মরণ ।
তিনি ছাড়া আর
বিরাট এ বিশ্বে তোর ভয় করিবার
নাহি নাহি নাহি অধিকার ।
হে অভয় মন্ত্র আজ জাগো,
ভারতের প্রাণে প্র ণে জাগো !
ভারতের গৃহে গৃহে, বুকে বুকে লভ যজ্ঞবেদী—
তা'রপরে রহ সমুজ্জ্বল
নিত্যকাল হে অভয় মন্ত্রের অনল ।
তব উচ্চারণ
সর্ব্বক্ষণ তোমায় স্মরণ
মুহূর্ত্তে করুক দূর যত মিথ্যাভয়
অলীক সংশয় ।
র্ব্বলের কাণে কাণে কহ অবিরাম
"এ সংসারে ভয় করিবার
তিনি ছাড়া আর,
নাহি নাহি তোর অধিকার ।"

ভাঙ্গন ও গড়ন

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস]

সৃষ্টির সুন্দর প্রকটন হয় ধ্বংসে! নতুন যুগের আরম্ভ হয় প্রলয়ের পশ্চাতে। পুরাতনের আগাগোড়া ভাঙ্গনের উপরেই নতুনের লীলাভবন গড়ে উঠে। কারণ বিশ্বনিয়ন্তার অপূর্ব্বলীলার এও একটা বিশেষ অঙ্গ যে যেখানে পুরাতনের কাঁটা বনে ঝোপে ঝাপে জঙ্গলে প্রাণসঞ্জীবনী আলোক বাতাস বন্ধ হয়ে যায় সেখানেই সে কাঁটার বাঁধন সে বনের আড়াল ভাঙবার প্রয়োজন সবার আগে। এ শুধু যে বাহিরের সৃষ্টির বিষয়ে সত্যি তা নয়, এ অন্তরের সৃষ্টির পক্ষে আরও বেশী করেই প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন পুরাণো ইমারত ভেঙ্গে তবে নতুন প্রাসাদ গড়তে হয়, তেমনি পুরাণো ভাবধারার জীর্ণ সরঞ্জামগুলি একবারে অপসারিত করে তার উপর গড়ে তুলতে হয় নতুনের সাধনভূমি। কারণ সবটাতেই মুক্তক্ষেত্র চাই, তবে নতুন সৃষ্টির পত্তন করা সম্ভব। বিশ্বজোড়াই এ ভাঙ্গন গড়নের খেলা চলছে, যেহেতু এ খেলায় স্বভাবের অনুমোদন আছে এবং সে অনুমোদন আছে বলেই এ লীলা তরঙ্গের উপর ভর দিয়ে প্রকৃতিরাণী তাঁর নতুন নতুন বিহারভূমি গড়ে তুলছেন। সব খানেই এ রকম ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে লীলাময়ের লীলা প্রকটনের পারম্পর্য্য রক্ষা পাচ্ছে। তাই ইউরোপের প্রচণ্ড ধ্বংস লীলার পরে নতুন সৃষ্টির জন্য একটা উদ্দাম চপলতা জেগে উঠেছে। সেখানে সব সংস্কার সব বাঁধন সব পদ্ধতি ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং সে ভাঙ্গনের পশ্চাতে মানুষ সবদিক দিয়ে মুক্ত বাঁধনহারা হবার চেষ্টা পাচ্ছে, কারণ তারা চাইছে নতুন সৃষ্টি নতুন গাঁথনীতে গড়ে তুলতে! বাঁধা সংস্কারে পুরাণো ভাবমোহে অন্ধ মন নতুন পথে এগোতে চাইলেও যে এগুতে পারে না, এটা খুব খাঁটি সত্যি কথা। স্বীকার করি পুরাণোর একটা প্রাণভোলান প্রচণ্ড মায়া আছে; যার জাল ছিঁড়ে নতুনের পথে এগোনো শুধু কঠিন নয় অনেক সময়ে অসাধ্য ও বটে, পুরাণোর ভয়ে পিছু টানে মানুষ কেবল যাই যাই করে আর চমকি চমকি পিছনে চায়। তাই সৃষ্টির চেয়ে ভাঙ্গন বড় কঠিন, কারণ ভাঙ্গন সুন্দর

হলে গড়ন ও সুন্দর হবে। এটা এখন সকলেরই মনে খুব দৃঢ় রকমেই ভিৎগেঁথে বসেছে যে নতুনের সৃষ্টির সময় এসেছে। এখন সকলেই নিশ্চয় বুঝছেন—

"শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাগলামি, তুই আয়রে দুয়ার ভেদি'।
ঝড়ের মাতন! বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাস্তে আকাশ খানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে,
ভুলগুলো সব আনুরে বাছা বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতার আহ্বানে সকল দেশেই শিকল দেবীর পূজাবেদী ভাঙ্গবার জন্য ঝড়ের মাতন আসেই। তখনই দেখা যায় অট্টহাস্তে দেশের আকাশখানা প্রতিধ্বনিত করে ভোলানাথের পার্শ্বচরেরা বিজয় কেতন নিয়ে ঝোলাঝুলি ঝেড়ে বেড়িয়ে পড়ে। তাতেই সমাজ ভাঙ্গে, সঙ্ঘ ভাঙ্গে, বাঁধা-ধরা একটানা ভাবধারা কোথায় লোপ পায় কে জানে, তখন আসে এক ভৈরব হুঙ্কারে প্রমত্ত নর্ত্তনে দেশের তরুণ কাঁচার দল। সব দেশেই এ কথার সত্যতার প্রমাণ হয়ে গেছে, সব সমাজেই ভাঙ্গার শক্তির পরীক্ষা হচ্ছে ও হবে, সকল সঙ্ঘেই পাগলামি এমনি করে বাঁধনের দুয়ার ভেঙ্গে ছুটে বেরোচ্ছে। কারণ মানুষ জানে সেই পথেই মানুষের শক্তির অখণ্ড ঘর।

যে বন্ধন ছিন্ন করতে হবে, যে জীর্ণ আবেষ্টনী টেনে ভেঙ্গে ফেলতে হবে, তার জন্য সময়ের অপেক্ষা করে পাঁজি পুঁথি হাতে নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে কেন। সেখানে অনেক মায়া কাটাতে হবে, অনেক লোভ দমন করতে হবে, সেখানে প্রাণ খুলে বলতে হবে—

"নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছ্বাসে।"

উদ্দাম বাসনাই সেখানে পথ প্রদর্শক। হয়ত অনেক সময়ে কত দিনের স্নেহবন্ধন ছিড়ে ফেলে চলে যেতে হবে, কত লোকগঞ্জনার ভিতর সরল মনকে আঘাত পেতে হবে; কিন্তু যখন সমাজের উন্নতির জন্য, দেশের উন্নতির জন্য, ধর্ম্মের উন্নতির জন্য প্রাণের মাঝে ভগবৎ প্রেরণা আসে, তখন সে

বিবেকের আহ্বানে কর্তব্যের ডাকে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়, অনেক বিরহবিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে তপঃশুদ্ধ হতে হয়, অনেক প্রীতির বন্ধন যা জীবনের বিমল রসে সিক্ত হয়ে প্রাণের মাঝে দৃঢ় হয়ে ভিৎ গেঁথেছে, সে সবগুলিও সমূলে টেনে ফেলতে হয়। ব্যাথা লাগে সত্যি কথা, কিন্তু যখন বুঝতে পারা যায় অন্তরের অন্তর থেকে কে আমায় কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়বার জন্য আকুলকণ্ঠে ডাকছে, যখন বুঝতে পারা যায় যে "মহাকাশ হতে ঐ বারে বার আমারে ডাকিছে সবে," তখন অনেক ব্যথা সহ্য করেও ছুটে আসাই পুরুষকার। তখন সে স্নেহপ্রেম ভালবাসার কাছে বিদায় নিয়ে বলতেই হবে—

"অরুণ তোমার তরুণ অধর করুণ তোমার আঁখি
অমিয় রচন সোহাগ বচন অনেক রয়েচে বাকী।"

কিন্তু উপায় নেই—

"আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর নির্মম আমি আজি
আর নাই দেরী ভৈরব-ভেরী বাহিরে উঠেছে বাজি।"

এখানেই সাধারণ মানুষ আর অতি প্রাকৃত লোকের মধ্যে প্রভেদ প্রকাশ পায়। সাধারণ মানুষ চায় নিজের পরিবারের মধ্যে আত্মস্থ থেকে শান্তির কোলে বসবাস করতে, সেই তার জীবনের চরম উদ্দেশ্য। তার পরিবারের বাহিরে দেশের বা দেশের কি অবস্থা হলো, তাদের উন্নতি করবার তার যদি শক্তি থাকে, সে শক্তি সে ব্যয় করবে কি না সে কথা সে ভাবে না কিংবা ভাববার চেষ্টাও করে না। কারণ জাতির বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যের দিকে ত তার লক্ষ্য নেই, তার লক্ষ্য আছে আত্মপরিবারকে কেন্দ্র করে যে ছোট একটি জগৎ সে গড়ে তুলেছে সেই স্বার্থের সীমার দ্বারা নিবদ্ধ একটা ছোট স্বার্থপর জগতের পানে। এমনি করে একটানা জীবন প্রবাহের সঙ্গে চলেই ত সাধারণ লোকে জন্মগ্রহণ করে, আহার নিদ্রা বিলাস নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে তারপর একদিন অন্তিম নিশ্বাস ফেলে অনন্ত জীবসাগরের মধ্যে জলবুদ্বুদের মত কোথায় বিলীন হয়ে যায় কে জানে! কিন্তু অতি প্রাকৃত লোকদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁরা নিজেদের পরিবার নিয়ে ক্ষুদ্রগণ্ডী বেঁধে সুখশান্তিতে থাকতে চান না, তাঁরা চান বিরাট দেশের সুখশান্তি নিয়ে গড়ে উঠতে। হয়ত তাতে তাঁদের নিজেদের পরিবারে মর্মান্তিক বেদনা পান, হয়ত সে বেদনার আঘাতে তাঁদেরও জীবনবীণার দু একটি তার বেসুরা হয়ে যায় এমন কি ছিঁড়ে পর্য্যন্ত যায়; কিন্তু তাঁদের লক্ষ্যস্থল অনেকটা বড়

কর্ম্মভূমিকে কেন্দ্র করে, তাঁদের জীবনের বাসনা নিজেদের ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পরিবারের সুখশান্তি পাওয়ার চেয়ে অনেক মহৎ। সেই জন্যই দেখি শ্রীচৈতন্য যখন মাকে কাঁদিয়ে স্ত্রীকে দুঃখ দিয়ে সব মায়া মোহের বন্ধন ছিঁড়ে এসেছিলেন দেশবাসীকে সুখ শান্তি দেবার জন্য, তখন তাঁর মনে নিশ্চয়ই এই ভাব প্রবল হয়ে ছিল—

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে, কে মোর আত্মপর ?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর।"

তাই এই মায়ারবন্ধনের ভাঙনের উপর গড়ে উঠেছিল, আচণ্ডালকে কোল দেওয়া একটা অপূর্ব্ব প্রেমের মন্দির। কোনও নতুন জিনিষ গড়তে হলেই আগে ভাঙনের প্রয়োজন।

বিশ্বের যে কোনখানে যা কিছু পবিত্র জিনিষ, কি ধর্ম্ম কি সাধনা, তা সব গড়ে উঠেছে ভাঙনকে ভিত্তি করে। কিন্তু যারা এই ভাঙন দিয়ে গড়নকে বরণ করে আনতে যান তাঁদের সব দেশে সব যুগেই অসহ্য লাঞ্ছনা প্রাণঘাতী গঞ্জনার মধ্যে কাজ করে যেতে হয়েছে। তাই যিশু খৃষ্ট যখন পুরাণের সংস্কারগুলি ভাঙতে ভাঙতে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করছিলেন, ঠিক সেই ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠছিল এক অতি পবিত্র যুগধর্ম্ম। এ ভারতেও যখন শাক্যসিংহ সকল মায়ার বেষ্টনী ভেঙ্গে আত্মপরিবার সকলকে কাঁদিয়ে বের হয়ে ছিলেন, তখন কি বুঝতে পারেন নি আমার পরিবারের সুখ শান্তি যে এতে একেবারে ভেঙ্গে যাবে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পাগলের মত বুকফাটা ক্রন্দন নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কেন ? কারণ এই ভাঙার দ্বারা একটা মহত্তর কিছু গড়ে তুলতে। তাঁকে যে উদ্দাম ভাবে পাগল করে ঘর ছাড়া করে নিয়ে এসেছিল, তা তাঁকে ভাবিয়ে দিয়েছিল—

"কিসেরি বা সুখ, কদিনের প্রাণ ?
ঐ উঠিয়াছে সংগ্রাম গান।
অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে"।

তাই অসহ্য নির্য্যাতনের পরে অসংখ্য ভাঙনের মাঝে গড়ে উঠেছিল এক প্রশান্ত বিশ্বধর্ম্ম, যার প্রচ্ছায় শীতল আশ্রয়ে এখনও পৃথিবীর কত লোক সুখ-শান্তি উপভোগ করছে। সবটাতেই দেখা যায় নতুন কিছু মহত্তর গড়তে হলে ভাঙনের প্রয়োজন সবার পূর্ব্বে। তখন দ্বিধা-সঙ্কোচ লাজ ভয় সব কিছু অগ্রাহ্য করে প্রীতি ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে কেবল ভাঙনের মুখে ছুটে

যাওয়াই শ্রেষ্ঠ পথ; তারপর দেখতে দেখতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে শিল্পকলা ধর্ম্ম সাহিত্য বিজ্ঞান প্রজ্ঞান যা কিছু তর্ তর্ করে অসম্ভব প্রয়াসে গড়ে ওঠে। সত্যি এই হচ্চে বিশ্বের ইতিহাসের ধারা।

তাই এ ভারতের যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের জাতীয় জীবন গড়ে তোলবার মূলে রয়েছে প্রকাণ্ড এক ভাঙ্গনের খেলা। কারণ যে বন্ধনটা বড় আঁকড়ে আছে, তাকে ছিন্ন করতেই হবে, যে শিকলটা গলায় বড় বাজছে তাকে ভাঙ্গতেই হবে। তারপর সেই মুক্তশক্তির উপর ভর দিয়ে সাধীনতার লীলা ভবন গড়ে উঠ্‌বে। আমাদের জাতীয় জীবন গড়বার পক্ষে বাইরের দিক থেকে সর্ব্বপ্রথম বাধা হচ্ছে সমাজের অটুট বন্ধনগুলি। আমাদের এই সমাজবন্ধনের মত এমন একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার আর কোনও সভ্যদেশে আছে কিনা সন্দেহ। এ শাস্ত্রের বিচার মানে না, গুণের আদর জানে না, একটা প্রবল ঝঞ্ঝার মত এসে দুমড়ে দিয়ে পিষে ফেলে একটা নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দেয় কারণ এ অন্তরে বাহিরে পরাধীনতার দেশে শাস্ত্র টাস্ত্র বড় কিছু নয় আচারই নাকি আসল ধর্ম্ম; আচার বন্ধনই আষ্টে পৃষ্টে মানুষকে বেঁধে রেখেছে। কপটতা ও সঙ্কীর্ণতায় সমাজ যে একেবারে অন্তর সার শূন্য হয়ে কেবলি ফেঁপে উঠেছে। প্রাণকে বাদ দিয়ে জড়দেহ বেশীক্ষণ আপনাকে খাড়া রাখতে পারবে না নিশ্চয়ই। অথচ এই হিন্দুসমাজই একদিন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব দিয়েছিল, ধীবর দৌহিত্র দৈপায়নকে বেদবিভাগের অধিকার দিয়েছিল এবং তারই ফলে কত পুরাণ কত সংহিতা হিন্দুশাস্ত্রকে জ্ঞানগৌরবে মণ্ডিত করে দিয়েছে। আর এখনকার হিন্দুসমাজ শুধু ত্যাগনীতি অবলম্বন করে গ্রহণের সামর্থ্যকেই একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। তাই প্রথমেই জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হলে এ সব সমাজ বন্ধনকে আগে ভাঙ্গবার প্রয়োজন হবে। এ সব বেষ্টনী ভেঙ্গে গেলেই সকলে এক অখণ্ড ধর্ম্মকে গড়ে তোলবার শক্তি পাবে। ধর্ম্ম প্রাণের জিনিষ, আচার কেবল বাহিরের ঠিকাদারি প্রহরীমাত্র। ভাঙ্গনের যে প্রয়োজন এসেছে, সে কথা না বুঝলে আর চলে না।

তাই দেশ এখন এসে পৌচেছে এমন অবস্থায় যেখানে—

"স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম;—প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্র বেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্ক শয্যা হ'তে। লজ্জা সরম তেয়াগি

জাতি প্রেম নাম ধরি ; প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মের ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"

জাতীয় জীবন গড়বার পক্ষে সমাজের বন্ধন যেমন বাহিরের প্রচণ্ড বাধা, তেমনি কুশিক্ষার বন্ধন তার অন্তরের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কারণ বর্ত্তমান যে শিক্ষা আমাদের দেশে খাড়া করা হয়েছে, তা পাশ্চাত্যের ব্যর্থ অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে প্রাণের অভাব বড় বেশী করেই অনুভব করা যাচ্ছে। এই শিক্ষা দীক্ষার ফলে আমরা আহারে ব্যবহারে আচারে বিচারে ভাষায় ভাবে ধর্ম্মে কর্ম্মে সমস্ত জীবন ক্ষেত্রে প্রতিপদে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে আসছি। মন্দিরের বদলে সভা করেছি, সদাব্রতের বদলে হোটেল খুলেছি, থিয়েটার করে আনন্দের মূল্য দুর্ভিক্ষে দান করি, লটারি করে অনাথ আশ্রমের চাদা তুলি ; দেশে যত রকমের স্বাস্থ্য রক্ষা করবার সহজ উপায় ছিল, তার বদলে বিলাতী খেলা আমদানী করেছি, অর্থোপার্জ্জন যে আমাদের জীবন যাপনের উপায় মাত্র তা ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যের নকলে অর্থোপার্জ্জনের জন্যই জীবন যাপন করবার চেষ্টা করছি। এমনি করে আমরা দেশের সাথে প্রাণের যোগ হারিয়ে ফেলেছি। আসল কথা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা দীক্ষার আদর্শও আগা গোড়া না ভাঙ্গলে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি গড়ে উঠ্‌বে কি করে। ইহাকে আমাদের দেশের স্বভাব ধর্ম্ম সভ্যতা ও সাধনার সাথে যোগ করে দিতে না পারলে এবং এই শিক্ষা সাধারণের সহজ প্রাপ্য করে তুলতে না পারলে আমাদের বোঁর বিপদের কথা। আমাদের হাব-ভাব আচার ব্যবহার সবই এত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের কোনও যোগই বুঝি নেই। এই শিক্ষার ফলে আমরা বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করে তার প্রাণের কাছে গিয়ে তাকে ছুঁতে পারিনি। আমরা মানুষ হয়ে উঠতে পারিনি একটু চালাক হয়েছি মাত্র। তাই আজ তথাকথিত শিক্ষিতের দল যারা "নিত্য বহে আপনার অস্তিত্বের শোক জনমের গ্লানি", তাদের অবস্থা দেখে বড় দুঃখে বলতে হয়—

"সমস্ত ধরণী আজি অবহেলা ভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।

* * * * *

আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
করেছে সঙ্কীর্ণ, রুধি দ্বার বাতায়ন

তারা আজ কাঁদিতেছে। আসিয়াছে নিশা,
কোথা যাত্রী, কোথা পথ, কোথায় রে দিশা।"

আর দেশের যারা সত্যি প্রাণ, যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পায়নি বলে আমাদের কাছে অবজ্ঞা পেয়ে আসছে, তাদের দয়ামায়া আছে, ধর্ম্ম আছে, তারা মানুষের দুঃখ বোঝে, অতিথি সেবা করে দেবতাকে ভক্তি করে। তারা ঘোর দারিদ্র্যের মাঝে মরতে মরতেও বাঙ্গালার নিজের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রেখেছে, যারা সব রকম সেবায় নিরত থেকে আজও বাঙ্গলার ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, যারা আজও শুদ্ধচিত্তে সরলপ্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে বাঙ্গলার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়; মস্‌জিদে মস্‌জিদে প্রার্থনা করে, যাদের জন্য বাঙ্গালী আজও বাঙ্গালী, যারা বাঙ্গালার জলের সঙ্গে এক হয়ে বাঙ্গালীজাতির জাতিত্বকে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালিয়ে জাগিয়ে রেখেছে, তাদের ভিতর দিয়েই বাঙ্গলার সনাতন শিক্ষার ধারা বয়ে আসছে। তারা সবল স্বাধীন সরলপ্রাণ, কোনওখানে আত্মার নিষেধ না মেনে এক মহান বিপুল সত্যপথে চলেছে, তাদের আদর্শ ই যে বাঙ্গলার আদর্শ। বর্ত্তমান শিক্ষাকে আমূল না ভাঙ্গলে জাতীয় শিক্ষার মন্দির গড়ে উঠবে না। এখন এমন শিক্ষা চাই যাতে দেশের আপামর দুনিয়ার জীবনযুদ্ধে যোগ দিতে পারবে, সকল জাতির সঙ্গে সমক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারবে। কারণ শিক্ষার মূলের কথাই হচ্ছে জাতীয় ও সামাজিক জীবনের সকল দিক দিয়ে পূর্ণ মনুষ্যত্ব গড়ে তোলা। এ শিক্ষার কণামাত্রও দেশবাসী এখনও পায়নি, তাই দেশে আজ মানুষের এত অভাব। সেই জন্যই দুঃখ করে আমাদের বলতে হয়—

"আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্ররুধির পুষ্ট বিলাস-লালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জ্জে মুখর-ঘর্ঘর
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্ব্বর
রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরমস্পর্দ্ধায়
নিঃসঙ্কোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে হায়,
নীরব-গৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ
সুবিরল—নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টালেশ?

কে রাখিবে ভরি নিজ অনন্ত আগার
আত্মার সম্পদরাশি মঙ্গল উদার ?

আজ তাই কেবল ভাঙনের পালা এসেছে, ভাঙতে ভাঙতে দেশ শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে। তারপর সেই শ্মশানে শক্তির সাধনা চলবে এবং বোধ হয় তখনি সেই ভাঙনের শ্মশানের উপর গড়ে উঠবে নতুন মনুষ্যত্বের নতুন সাধনার দেবমন্দির। এ ভাঙনের মাঝে প্রবল হৃদয় শক্তির প্রয়োজন হবে, ভগবানের কাছে ব্যাকুলকণ্ঠে প্রার্থনা করতে হবে—

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য জ্বলে উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে ; যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।"

তারপর জগতের সব চেয়ে বড় সমস্যা জীবন সমস্যা। ধর্ম্মের পথে থেকে বিবেকের বাণী অনুসরণ করে জীবিকা অর্জ্জন করা এখন একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপার্জ্জনের পথ এত সঙ্কীর্ণ যে মিথ্যার আশ্রয় না নিলে সেখানে প্রবেশ করা কঠিন। এই জন্য জাতীয় আদর্শ হারা হয়ে উঠছি, অন্তরের কোমলতা হারিয়ে ফেলছি। এখানেও শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়েছে। তাই এ সব উপার্জ্জনের পথ ছেড়ে দিয়ে ভারতের যে আদর্শ সেই পবিত্র সরল জীবন তারই পথ ধরবার চেষ্টা করতে হবে। সেই জন্যই দৈনিক আহার বস্ত্র সংগ্রহ করবার পক্ষে এই পরিবর্ত্তনের মোহনায় মিল ফ্যাক্টরী ছেড়ে দিয়ে চরকা তাঁত প্রভৃতি সহজে জীবিকা লাভের ব্যবসায় গ্রহণ করা আবশ্যক হবে। শুদ্ধচিত্তে পুণ্যমনে সংযম ত্যাগ ও বিলাসবিহীনতার পথ ধরে লুপ্ত মনুষ্যত্ব অনুসন্ধান করে আনতে হবে। তাই এ ভাঙনের পথ এখন সব চেয়ে বড় পথ, কারণ বর্ত্তমান যুগপ্রেরণাও ঐদিকেই ইঙ্গিত করছে। ভেবে ভেবে পথ চেয়ে বসে থাকলে আর চলবে না, কারণ ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গেই গড়নের পত্তন হতে থাকবে। শুধু সমাহিতমনে তপঃশুদ্ধপ্রাণে সেই ভাঙন-গড়নের একমাত্র নিয়ন্তার কাছে নত হয়ে নিবেদন করতে হবে—

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়,

এই চির পেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারংবার
মনুষ্যমর্য্যাদাগর্ব্ব চির পরিহার।
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর কর। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোকমাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।"

কোকিল ছানা

[শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী]

সত্যঘটনা

নিরাশ্রয়া অন্ধ দুঃখিনী কুলীরমণী সে। আড়কাঠির প্রলোভনে পড়িয়া আসামের চা বাগানে গিয়াছিল।

আজিকালকার দুর্দ্দিনে, ও দৈন্যও অভাবের নিদারুণ নিষ্পেষণে যখন তাহারা মরিয়া হইল, তখন একদিন দলে দলে আসাম কুলীরা "মহাত্মা গান্ধী জী কি জয়" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কোনো প্ররোচনা, কোনো ভয়-দেখানোর পরোয়া আর তাহারা রাখিল না,—প্রতিজ্ঞা এবার দেশে ফিরিবেই। এ মাত্র সেদিনের কথা,—সবে দীনহীনের আত্মশক্তির উদ্বোধন হইতে সুরু হইয়াছে।

আসাম হইতে দলে দলে কুলীরা আসিয়া চাঁদপুর জুটিল। সরু সরু হাত পা, পাঁজরের হাড়গুলি গোণা যায়, সারা দেহের গাঁটগুলি অস্বাভাবিক রকম স্ফীত, টোলপরা গালের উপরে চোয়ালের হাড় পাহাড়ের শৃঙ্গের মত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে—সারা গায়ের মধ্যে হাড়ের ফ্রেমে আঁটা পাম্পকরা ফুটবলের

মতো পেটটাই দর্শন যোগ্য হইয়া বাড়িয়াছে। তাহাতে নীল নীল শিরাগুলি ভাসিয়া উঠিয়াছে,—সেগুলি দূরবীনে-দেখা মঙ্গলগ্রহের খাল!

'পরিধানে চীরবাস'—অত্যন্ত ময়লা, যেন কাদা জলে ডুবাইয়া রৌদ্রে শুকান হইয়াছে। তা'ও পুরুষদের কৌপীনের মতো পরা মেয়েদের বক্ষ হইতে আজানু কোন প্রকারে ঢাকা। মাথার চুল স্ত্রী পুরুষের উভয়েরই অতি অল্প, তৈলাভাবে রুক্ষ ও জটিল। সকলের সঙ্গেই এক একটী পুঁটুলী আছে, তাতে সম্বল—একটা ঘটি, খান কয়েক ছেঁড়া ন্যাকড়া, চার ছ' আনার পয়সা —আর একটী করিয়া তামার চাকৃতি। ঐ তামার চাকৃতিই নাকি তাদের বাগানে অমূল্য সম্পদ, উহা চা-কোম্পানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত-করা দোকানে দেখাইলে তিনটী আনা মুল্যের খাদ্যসামগ্রী তাহাদের দেওয়ার কথা। ইহার উপর দোকানদারের "ফাউ" লাভ ত আছেই। বেচারা পাইতে পাইতে পায় গিয়া হয় তো আট পয়সার জিনিষ। মাইনা বাবদ নগদ পয়সা কুলিদের হাতে দেওয়া হয় না, পাছে পয়সা জমাইয়া তাহাদের খর্পর হইতে উহারা পালায়। প্রায়েরই উপর মা ষষ্ঠির যথেষ্ট কৃপা আছে বলিয়া বোধ হইল—প্রত্যেকের সঙ্গেই দুইটী তিনটী করিয়া অপগণ্ড আছে,—প্রায়ই উলঙ্গ বা অর্দ্ধ উলঙ্গ। সবারই চেহারা এক রকম,—হাড়ের কাঠামের উপর যেন আঠা দিয়া চামড়া জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এরা সব যেন মূর্ত্ত নিঃস্বতা!

হাঁ্যা সেই কুলিরমণীর কথা বলছিলাম। যখন দলে দলে কুলী আসিয়া চাঁদপুরে জড় হইল, তখন সেও আসিয়াছিল। নদীর পাড়ে মারক্যান্টাইল ব্যাঙ্ক এর পাট গুদামে হইয়াছিল তাহাদের আস্তানা। এক একটা গুদামে থাকিত সত্তর, আশী নব্বই জন করিয়া! বিসূচিকা দেখিল বড় সুযোগ যায়,—সে স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতে বিলম্ব করিল না। যাঁহারা কাগজ পত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন কিভাবে তখন কুলীর দল নিঃশেষিত হইতেছিল। রোজ পনর,—বিশ—পঁচিশটা করিয়া লোক মারা যাইত। ব্যামোটা হইত ভারি অদ্ভূত রকমের—আগে ধরিত পেটের অসুক বা' আমাশায় রোগে। দুই একদিন পরে বিসূচিকা লক্ষণ দেখা দিত।

সে দিন আস্তানায় তদন্ত করিতে গিয়া আমি অন্ধ রমণীটীকে কুড়াইয়া আনি। রোগের আক্রমনে শিথিল হস্তে সে তখন তাহার শিশুটীকে আঁকড়াইয়া ছিল। শিশুটী একটু অস্বাভাবিক, সাধারণ কুলী বালকদিগের মতন অত কালো নয়,—কালো নয় কেন বেশ ফর্সাই। হৃষ্টপুষ্ট না হইলেও

গাল দুটী নিটোল। পেটটা অপেক্ষাকৃত বড় হইলেও প্লীহা এখনও খুব বেশী বাড়ে নাই। লম্বা লম্বা চুলগুলি ঈষৎ পীতাভ চোখ দুটীর উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—তাহারই ফাঁকে ফাঁকে বালিকা টুলটুল করিয়া তাকাইতেছিল। দেহের উপর দিয়া তাহার বোধ হয় বার দুই বসন্তের হাওয়া বইয়া গিয়াছে।

ষ্ট্রেচার"—এ মা-মেয়েকে লইয়া অসিয়া যখন রুগ্নাকে বিছানায় শোয়াইবার জন্য বালিকাকে তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইলাম, তখন প্রায় সংজ্ঞাহীন মেয়েটীর দুর্ব্বল হস্তের বাঁধুনি খুলিয়া আসিতেছে আঁকড়াইয়া ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে বলিয়া উঠিল" মেরী—মেরী লড়্‌কী-মেরী লড়কীকো কাঁহা লেতেহো বাবুজী" ?

আমি শিশুকে বাঁহাতে বুকে তুলিয়া লইতে লইতে তাহার উদ্যত হাতদুখানি আস্তে আস্তে বুকের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিলাম "কুছ ডর নেহি মাই, হামরা পাস তেরী লড়কী বহুত আচ্ছা হালমে রহেগী,—দুখার মে তুম্ কেইসে আপনী লড়কীকে তদ্‌বির করোগি।"

প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে মেয়েটী বলিল "নেহি নেহি বাবুজী, লড়কীকো দেও—মেরী লড়কী" আমার সঙ্গী কালিকেশববাবু রোগিণীকে ষ্ট্রেচার হইতে শয্যায় তুলিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন,—তিনি বলিলেন "মাই— কোন চিন্তা নেই তোমার। তোমার মেয়ে ভালোই থাকবে। রোজ দেখো—তোমায় দেখিয়ে নে যাবো,—তুমি শীগগির ভালো হয়ে ওঠো—"

"—নেহি—নেহি"—বলিতে বলিতে মেয়েটী অত্যন্ত অস্থিরভাবে একহাত আমার ক্রোড়স্থ শিশুর পানে বিস্তৃত করিয়া দিয়া অন্যহাতে মাটী ভর করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ দুই তিন সেকেণ্ড পরে তাহার মাথাটা টুপ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি কালীবাবু নীচু হইয়া রোগিণীর মাথা বামহস্তের উপর তুলিয়া ধরিলেন বটে, কিন্তু সে এই উত্তেজনায় ও পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কালীবাবুর হাতের উপর তাহার মাথাটা গড়াইতে লাগিল,—সে বলিতেছিল "নেহি বাবুজী, মেরী লেড়কী, মেরী—মেরী দুলারী,—মেরী লেড়কী"—কালীবাবু তখন সন্তর্পণে রোগিণীকে বিছানায় তুলিয়া শোয়াইয়া দিলেন। আমি আর কোনো কথা না বলিয়া মেয়েটীকে বুকে লইয়া বাহির হইয়া গেলাম রেজিষ্ট্রী অফিসে,—রোগিণীর নাম ভর্ত্তি করিবার জন্য। রাস্তায় আশুবাবু, বিনয় ও রামকৃষ্ণমঠের সন্ন্যাসী স্বামী ভূমানন্দের সহিত দেখা হইল। তিন জনেই বলিলেন "বাঃ দিব্য—

ছেলেটীতো দেখছি,—কোথায় পেলে ?" আমি শুধু জবাবে "না মেয়ে"—বলিয়া অগ্রসর হইয়া গেলাম।

শেষ রাতের দিকটায় আবার আমার ডিউটী ছিল। ডিসেণ্টী ওয়ার্ড এ ডিউটী করা এক ভারী বিশ্রী ব্যাপার। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রোগীদের বিছানা বদলাইতে হয়,—একটুও পা জিরাইবার জো নাই। একদফা সবগুলি বিছানা পরিস্কৃত করিয়া একটা টুল টানিয়া একটু বসিয়াছি, চোখ দুইটা যেন আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিতেছিল ;—এমন সময় সেই অন্ধ রমণীর পাশের রোগীটা ডাকিয়া উঠিল 'বাবুজী—পানি"। আমি ত্ড়বড় করিয়া বলিয়া উঠিলাম "লাতা হুঁ",—মনে হইতেছিল দুই তিন বার ডাকিয়া হয়তো বা রোগীটা সাড়া পায় নাই। মেজার গ্লাসে করিয়া তাহার মুখে একটু জল ঢালিয়া দিলাম ;—দিয়া চলিয়া আসিতেছি এমন সময় সেই অন্ধ মেয়েটী বলিল "বাবুসাব মেরী লড়কীকো কাহা ভেজা" ? আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম, সেই সকালবেলা গোটা দুই কথা মাত্র ইহার সঙ্গে কহিয়াছি, ইহার ভিতর সে আমার গলার আওয়াজ চিনিয়া ফেলিয়াছে।

গলার স্বর তাহার উদ্বেগ কম্পিত।

রোজ রোজ পোনের বিশটা করিয়া লোক মরিতে দেখিয়া উহাদের একটা আতঙ্ক হইয়া গিয়াছিল যে হাসপাতালে আসিলেই রোগী বুঝি আর বাচেনা। এই ভয়ে অনেকে রোগ গোপন করিয়া থাকিত। ব্যারাকের পরিদর্শক ডাক্তারকে কোন কথা বলিত না—ও ইহার ফলে প্রায়ই সকালবেলা ব্যারাক পরীক্ষা করিলে দুই তিনটা মৃতদেহ পাওয়া যাইত। মেয়েটীর হয়তো মনে হইতেছিল তাহাকে যখন হাসপাতালে আনা হইয়াছে,- তখন সে তো বাচিবেই না,—মরিবার আগে বুঝি সে তাহার নয়নমণি কন্যাটীকেও দেখিতে পায়না ! আমি কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া সরিয়া আসিতেছিলাম,—পায়ের শব্দ অনুসরণ করিয়া সে এবার জোরে ডাকিল 'বাবুজী—"

এবার আর জবাব না দিয়া পারিলাম না, বলিলাম "কেও মাই, তুমারী ছোকরী তো আবহি নিন্দ মে হ্যায়। ফজির হোনে দেও তব উসীকে তুঝে দেখলাউঙ্গা"।

ব্যগ্রকণ্ঠে রমণী বলিল "ফজির তো হো গিয়া বাবুজী—"আমি একটু বিরক্তি পূর্ণ কণ্ঠে কহিলাম "নেহি নেহি ফজির নেহি হুয়া নিন্দ যাও আভি"—স্বরে বিরক্তির রেশটা বোধ হয় সে ধরিতে পারিয়াছিল, গলা নামাইয়া ভীত ধীর

কণ্ঠে সে বিড় বিড় করিয়া বলিল "নিন্দ বাবুজী,—মেরী দুলারী—ইয়ে দো বরষ, মেরী দুলারী—কলিজা মেরী কলিজা"—লণ্ঠনের মিটমিটে আলো তাহার গালের একপাশে পড়িয়াছিল, দেখিলাম সূক্ষ্ম একটী অশ্রুরেখা তাহার উপর চিক্ চিক্ করিতেছে। একটু কষ্ট হইল। একবার ভাবিলাম দুইটা মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দি। কিন্তু এত রাত্রে কিছু বলিলাম না। দুঃসহ রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও সমস্ত ব্যথা ছাপাইয়া কোন্ শক্তির বলে যে তাহার মেয়ের ভাবনা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, তাহা রাত্রি জাগরণে শ্রান্ত আমার ভাবিবার অবসর ছিল না। তাহার পরে একদিন সে আমাকে বলিয়াছিল, যে দুলারী তাহার কী,—সে যে তাহার কলিজার কলিজা। বর্ষ দুইটী বক্ষোনীড়ে জড়াইয়া ধরিয়া সে তাহার দুলারীর মাথাটী বুকের মাঝে খুঁসিয়া রাখিয়াছে,—রো-জ রাতে। একান্ত নির্ভরতায় লতাইয়া পড়া দেহখানি,—সে ঘুমের ভাঙ্গনের মধ্যে মধ্যে কতবার চুম্বনে ভরিয়া দিয়াছে। চুম্বনের দৌরাত্ম্যে আধঘুমভাঙ্গা শিশু কী রকম ছোট্ট ছোট্ট আঙ্গুলগুলি দিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া ওষ্ঠাধর বিচ্যুত মাতৃস্তনটীকে মুখে পুরিয়া আবার চুক্চুক্ সুরু করিয়া দিত! তার এক সাজি কুন্দফুলের মতো দেহখানি নড়িয়া চড়িয়া উঠিলে কি তাহার কোমলস্পর্শ,—অন্তে তাহা কি বুঝিবে? তাহার মাথার ঘ্রাণ মায়ের মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়া কি রকম জানি মোহতন্দ্রার সৃষ্টি করিত,—মা আবার ঘুমাইয়া পড়িত। আজ চব্বিশ মাস এমনি গিয়াছে। সে বুক তাহার খালি! তার ছোঁয়ার অনুভূতিটুকু নাই, মৃদু নিশ্বাসের শব্দটুকু শোনা যায় না, মাথার ঘুম-পাড়ানি ঘ্রাণটুকু হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে না, তাহার ক্ষুধিত বাহুর আলিঙ্গনে কুন্দকুসুমের ডালি তুক্ তুকে নরম দেহখানি সে আজ হাতড়াইয়া মরিতেছে, সে ঘুমায় কি করিয়া,—আর বাবুজী তাহাকে বলিয়াছেন নিন্দ্ যাইতে!

ঘণ্টা খানেক পরে মেয়েটী ভীত কুণ্ঠিত স্বরে আবার প্রশ্ন করিল "বাবুজী —ফজির—" কি করুণ তাহার স্বর! বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, রাতের আঁধার আর প্রভাতের আলোতে স্বাগত সম্ভাষণের কোলাকুলি সুরু হইয়াছে। আকাশে দু' একটা তারা তখনও উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। আমি এবার একটু কোমল কণ্ঠেই বলিলাম "হাঁ মাই আব্ হি উসীকো লাউঙ্গা,—এক ঘণ্টা ঔর সবুর করনা।"

"ঔ—র এক ঘণ্টা" টানিয়া টানিয়া এইটুকু বলিয়া সে তখনকার মত চুপ করিল।

(২)

সে দিন মিসেস্ স্মিথ্ রোগিদের দেখিতে একবার আসিয়াছিলেন। মিসেস্ স্মিথ্ ওখানকার পাদ্রী-সাহেবের পত্নী। তাঁহার কাছে কয়েকটী পিতৃমাতৃহীন কুলী বালকবালিকা রাখা হইয়াছিল। আমরা ঠিক করিলাম এই অন্ধরমণীর বালিকাকেও তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিব। তিনি সানন্দে রাজী হইলেন। পাদ্রীসাহেবের মতলব ছিল উহাদিগকে সব খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন। কিন্তু তাহা আমরা দেই নাই। পাদ্রীসাহেব উহাদের অবশেষে ছাড়িয়া দিতে একটু গররাজী ভাব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ডাক্তার বাবু ভারী স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। তিনি পাদ্রী সাহেবকে বলিয়াছিলেন "যদি তোমরা এদের একটাকেও খৃষ্টান কর, we shall make christianity inpossible in India" ক্ষুন্ন হইয়া ইহার উত্তরে সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কেন ডাক্তার বাবু খৃষ্ট ধর্ম্মটা কি খারাপ মনে করেন আপনি" ডাক্তার বাবু জবাব দিয়াছিলেন "ধর্ম্ম কোনোটাই খারাপ নয়। কিন্তু খৃষ্টান করে তোমরা মানুষ তৈরী কর না কতগুলি দাস তৈরী কর। যে ধর্ম্মে জাতীয়তা বোধ ভুলিয়ে দেয় তা' অবার ধর্ম্ম? খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করে তোমরা প্রভু যিশুখৃষ্টের সেবক তৈরী কর না ইংরেজ বানিয়ে তোলো। তারা কেন যেন আর ভারতবাসী থাকে না,— হাজারে হাজারে এ প্রমাণ তোমায় আমি দিতে পারি।"

এ অপ্রিয় সত্যের জবাব কিছু ছিল না কাজেই পাদ্রী সাহেবও দেন নাই, শুধু "হ্যাঁ হ্যাঁ তা কি—সেটা কি—" ইত্যাদি বলিয়াই ক্ষান্ত পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক ইংরেজ মিশনারীরা রাজনৈতিক কার্য্যের পরোক্ষভাবে যে কত সাহায্য করিতেছে বলা যায় না।

বেলা প্রায় আটটা বাজে। মেয়েটীকে কোলে করিয়া আমি গিয়া রোগিণীর শয্যার পাশে দাঁড়াইলাম; ইচ্ছা ছিল মাকে একবার বলিয়া মেয়েকে পাঠাইয়া দিব। ডাকিলাম "ধনরাজিয়া—"

অন্ধ রমণীর নাম ধনরাজিয়া।

"—বাবুজী"

"তোমার লড়কীকে তো মেম সাহেব নিয়ে যাচ্ছে, তুমি ভালো হলে আবার নিয়ে আস্‌বেন।"

"মেম সাব,—নেহি বাবু মেরী লড়কীকো মেরী পাস্ রহনে দিজিয়ে।"

"তোমার অসুখ যে,—ব্যামোর কাছে থাকলে এরও ব্যামো হবে যে।"

সে দিনই সকালে তার কলেরার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল।

আতঙ্কের স্বরে ধনরাজিয়া কহিল" উসী কো ভি বুখার হোগা—উসী কো—"

"হাঁ মাই উসীকো ভি বুখার হোগা," তার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

আশু দাদা মিষ্টি স্বরে কহিলেন, "রোতী হো কেঁও মাই?—লড়কীকা ভালা করনেকে লিয়ে তো এইসা কাম করতে হেঁ,"—আশু দাদা সাধু পুরুষ। এমন অদ্ভুত লোক আর দেখি নাই। মলমূত্র তিনি চন্দন জ্ঞানে দুইহাতে ঠেলিতেন। তাঁহাকে কুলীরা সবাই 'বাবা' বলিয়া ডাকিত।

অন্ধ রমনী আশু দাদার পানে মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে ঘাড়টা নাড়িতে নাড়িতে কম্পিত কণ্ঠে কহিল "তুম্ ভি কহতে হো বাবা—আচ্ছা তব যানে দেও—লেকিন মেরী পাস্ এক দফে উসীকো লাও বাবুজী।" ডাক্তার বাবু চোখ ঠারিয়া ঈষারায় রোগীর কাছে শিশুকে লইতে মানা করিলেন। পরে কহিলেন "মাই বুখার ওয়ালী জনানা কা পাস্ লড়কীকো নেই লেনা চাহিয়ে।"

আমি রোগিণীর বিছানার পাশ কাটাইয়া মেম সাহেবের কোলে শিশুকে দিতে অগ্রসর হইতেছিলাম, হঠাৎ ধনরাজিয়া কাৎ হইয়া খপ করিয়া আমার পাঞ্জাবীর নীচের পকেটটা ধরিয়া ফেলিল। ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া ঠিক মত বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। আর্ত্তকণ্ঠে রমণী একবার চেঁচাইয়া উঠিল "দুলারী ও—বা—বু—জী—" তারপর আপাদ মস্তক কম্বলটা টানিয়া দিল। মেমসাহেবের কোলে যাইতেই শিশু হাত পা ছুড়িয়া বিষম কান্না জুড়িয়া দিল। মেমসাহেব রোরুদ্যমান শিশুকে সাম্‌লাইতে সামলাইতে প্রস্থান করিলেন। কাপড় ঢাকা মেয়েটীর পানে চাহিয়া দেখিলাম। ফুলিয়া ফুলিয়া তাহার সে কি কান্না!

* * * * * *

পরে একদিন কন্‌ভেন্ট-এ গিয়াছিলাম। শুনিলাম দিন পোনেরো ষোলো দুলারী নাকি মার জন্য অনেক কান্নাকাটি করিয়া ছিল। তারপর সেখানকার লোকদের, বিশেষতঃ মিসেস্ স্মিথ্-এর চেষ্টায় বনের পাখী বেশ পোষ মানিয়াছে, দিব্য এখন সে হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া বেড়ায়। এখন কান্নাকাটি গিয়াছে। সে হাসেও খেলেও,—তার দুষ্টমীতে সবাই অস্থির। তার নতুন নাম হইয়াছে 'লিলি'।

* * * *

পাঁচ সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে। রমণী প্রায় সারিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের উপরে রোগ জনিত পাণ্ডুর আভা এখনও মিলায় নাই। তথাপি দ্বাবিংশ বৎসরের পরিপুষ্ট যৌবনশ্রী তাহার দেহখানির উপরে যে সহজ লাবণ্যের ছোপটুকু ধরাইয়া দিয়াছে তাহা এত অত্যাচারেও সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই।

আজ খুকীকে লইয়া আসিবার দিন। আমি দাওয়ার টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া রোগীদের জন্য মন্টেড মিক্স তৈরী করিতেছিলাম। এই মাত্র সে আমার কাছে বসিয়া তাহার প্রিয়তমা লড়্কীর ইতিহাস শেষ করিয়াছিল। বাগানের মেয়েদের মধ্যে সেই নাকি খুবসুরৎ ছিল,—তাইতে সে ছোট সাহেবের নেকনজরে পড়ে। সাহেব তাহার চোখদুটীর নাকি খুব তারিফ করিতেন। সেই চোখ দুটীই যখন তাহার টাইফয়েড জ্বরে সে জন্মের মত হারাইল, তখন সাহেব ছিন্ন মালার মতো তাহাকে পথের পার্শ্বে ছুড়িয়া ফেলেন। তখন দুলারী পেটে। ফের সে চায়ের পাতা তুলিতে লাগিয়া যায়। কিন্তু তাহার বরাদ্দ হইল দৈনিক তিন আনার জায়গায় ছয় আনা। কিন্তু সেটা ছোট সাহেবের অন্ধ রমণীর প্রতি করুণার পরিচয় কিম্বা প্রণয়ের প্রতিদান তাহা ঠিক বলা যায় না। তারপর দুলারী হইল। সেই একমাত্র তাহার খালি বুকটাকে ভরিয়া রাখিয়াছে বলিয়া তাহার নাম সে সাধ করিয়া রাখিয়াছিল দুলারী। কি করিয়া সে যে তাহাকে মানুষ করিয়াছে! রোজ ছ' আনা সংগ্রহের মধ্যে দুলারীকে খাওয়াইয়াছে তিন আনা, তার বিবাহের জন্য জমা করিয়াছে দুই আনা, আর তাহার নিজের জন্য ব্যয় হইয়াছে চার পয়সা। এই গেল তাহার দুই বৎসরের ইতিহাস। এই নির্লজ্জ নির্ম্মতার কাহিনী সে বেশ নিঃসংকোচে বলিয়া গেল। বোধ হইল—যেন এ অতি সাধারণ কথা, নিত্যকার ব্যাপার। আমি ভাবিতেছিলাম,—কিন্তু সন্তানের জন্য এই যে অগাধ স্নেহ—ইহা এই বন্য অসভ্য স্ত্রীলোকটা কোথায় পাইল?

তখন সূর্য্য ডোবে ডোবে। কাহিনী শেষ করিয়া মিনিট দুই সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সন্ধ্যার আঁধার যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল ততই তাহার উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। অষুধপত্র রাখিবার টেবিলটার হাত চারেক দূরে একটা মাদুরের উপর সে বসিয়াছিল আর গায়ের কম্বল খানার প্রান্তভাগটা মাঝে মাঝে অকারণ নির্দ্দয় ভাবে মোচড়াইতেছিল। মাঝে মাঝে মাদুরটাকে দুইহাতে ঝাড়িতেছিল,—কখন শুইতেছিল আবার একটু পরেই উঠিয়া বসিতেছিল। তাহার কাহিনী শেষ হইবার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে

সে আমাকে অন্তত সাত আটবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে মেম সাহেব আসিবে কি না,—কখন আর আসিবে সন্ধ্যা যে হইতে চলিল, তাঁহার অসুখ হইয়াছে নাকি,—ছুলারী ভালো আছে তো,— মেম সাহেবের কুঠি খুব দূরে নাকি—আরো সব কত কি! আমি রোগীদের ফরমায়েস যোগাইতে যোগাইতে দুই একটা হাঁ না বলিয়া তাহার জবাব সারিতেছিলাম। ক্রমে সে বড়ই উতলা হইয়া পড়িল। মাঝে মাঝে তাহার চোখের কোনে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিতে ছিল—এবং ক্ষণে ক্ষণে আমার আশ্বাস পাইয়া নিজের অহেতুকী আশঙ্কাতেই একটু একটু হাসিতেছিল বোধ হয়। আশুদাদা ইতোমধ্যে একবার উহাকে বলিয়া গেলেন ঘরে যাইতে, যে সন্ধ্যা হইয়াছে হিম লাগিবে। নরেনও বার দুই বলিল, কিন্তু কোনো কথাই তাহার কাণে যাইতে ছিল না।

গোটা সাতেকের সময় ছুলারী ওরফে লিলিকে কোলে করিয়া মিসেস স্মিথ্ দেখা দিলেন। আমি চেঁচাইয়া বলিলাম ধনরাজিয়া তুহারী লেড়কী আগয়ীরে আমারও ভারী আনন্দ হইতেছিল। আমারি হাতের রোগী এতদিনে সারিয়া উঠিয়া মা মেয়ে আবার দেশে যাইবার স্বপ্ন দেখিতে থাকিবে! চাহিয়া দেখিলাম, —আমার কথা শুনিয়া আনন্দের আতিশয্যে তাহার বুক দ্রুত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, যেন তাহার শ্বাসরোধ হইতে চলিয়াছে। আজ ছত্রিশ দিন সে তাহার খুকীকে বুকে করে নাই; এতকাল পর মৃত্যুর দুয়ার হইতে ফিরিয়া সে কি তাহাকে সত্যই পাইবে?

রুদ্ধকণ্ঠে সে চেঁচাইয়া উঠিল "ছুলারী"—কী সে ডাক, যেন মমতার উৎস ক্ষরিয়া পড়িতেছে।

ছুলারী তখনও মেমসাহেবের কোলে। পরণে তার ধবধবে সাদা একটা ফ্রক, পায়ে কাটার বোনা উলের মোজার উপরে বোতাম লাগানো ভেলভেটের জুতা, মাথায় লালরংএর একটা টুপী। মেম সাহেব তাহাকে কোল হইতে নামাইতে নামাইতে কহিলেন "যাও লিলি, তুমহার মাইকা পাশ যাও"। লিলি তখন মিসেস্ স্মিথ এর বুকে সরু চেইনে ঝুলান সোনার ক্রুশটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল।

ব্যাগ্র বাহু মেলিয়া ধনরাজিয়া ডাকিল "মেরী মাই,—মেরী ছুলারী—"

কিন্তু খুকী তার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া মেমসাহেবকে দুই হাতে জড়াইয়া পরণের মধ্যে মুখ লুকাইল। মুহূর্ত্তেক পরে একবার আড়চোখে মলিনবসনা রমণীর পানে চাহিয়া শিশু নিজের মাকে বলিল "তুম দাই বহ মেরী মাই নেহি।"

———

উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত

[শ্রীউর্ম্মিলা দেবী]

ভারতের নারীশক্তি একবার ওঠ! জাগ! তোমার আপন আসন একবার গ্রহণ কর! তোমার সহধর্ম্মিনী নাম সার্থক কর। যার আশীর্ব্বাদে জীবন সার্থক করিবার এমন সুযোগ পাইয়াছ, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কর্ম্ম সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়। দেশ মাতৃকার আহ্বানে সমস্ত দেশবাসী সাড়া দিয়াছেন, তোমরা কি সাড়া দিবে না? তবে কি করিয়া এই মহাযজ্ঞ সাধিত হইবে? "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!" এই জননীর কি তুমিও সন্তান নও? পুত্রই কি মাতার সন্তান, কন্যা কি সন্তান নয়! একবার ভাবিয়া দেখ এই মা তোমার কত স্নেহশীলা! গর্ভধারিণী জননী অপেক্ষাও কত ধৈর্য্যশালিনী! এত অত্যাচার মার উপর করি,—গর্ভধারিণী জননীও এত সহ্য করিতে পারেন না। তিনিও সময় বিশেষে ধৈর্য্যহারা হইয়া সন্তানকে তিরস্কার করেন, প্রহার করেন। কিন্তু দেশমা আমার চির স্নেহশীলা, চির ধৈর্য্য-শীলা! সন্তানের সুখের জন্য যে বুক পাতিয়াই দিয়া আছেন!! কত অত্যাচারই না আমরা তাঁর প্রতি করি! তাঁর বক্ষে নিয়ত পদাঘাত করি, তাঁর দেহে আঘাত করিয়া শস্যের সংস্থান করি, তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তৃষ্ণার বারি সংগ্রহ করি, তাঁর রক্তে পুষ্ট বৃক্ষ লতাদি হইতে ফল মূল আহরণ করিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করি! কিন্তু কৈ! এত অত্যাচারে তো মা আমার অধীর হন না! একবারও তো বলেন না, "ওরে! আর তো পারি না!" এমন মা কি আর হয়! কিন্তু আমরা কি করিয়াছি? এমন মাকে আমরা পরের হাতে তুলিয়া দিয়াছি। আমাদের অপরাধে আজ তিনি পরহস্তে বন্দিনী! দীনা, হীনা, উপবাস খিন্না শৃঙ্খলিতা মা আজ করজোড়ে সন্তানের নিকট মুক্তি চাহিতেছেন, এসময়ে মায়ের অর্দ্ধেক সন্তান যদি নীরব নিশ্চেষ্ট হইয়া ঘরে বসিয়া থাকেন তবে কিসের তাঁরা সন্তান, আর কিসের তাদের মাতৃগৌরব! একবার ভাবিয়া দেখ কোন দেশের নারী তোমরা! যে দেশে সীতা সাবিত্রীর মত নারী সতীত্বের মহিমা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, যে দেশে গান্ধারীর মত জননী ধর্ম্মের মহত্ব প্রচার করিয়াছেন, যে দেশে দ্রৌপদীর মত নারী সেবার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যে দেশে সুমিত্রা উর্ম্মিলার মত নারী ত্যাগের

মহিমা প্রচার করিয়াছেন সেই দেশের নারী তোমরা! যে দেশে রাজপুত রমণীগণ স্বামী পুত্রকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করিয়া সমরে পাঠাইতেন, আপন কেশ কর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করিয়া দিতেন, স্বামী পুত্রের পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিলে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করিতেন, আবার হাসিতে হাসিতে জলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া পরলোকে স্বামীর সহিত মিলিত হইতেন! সেই দেশেরই নারী তোমরা! যে দেশের নারীজাতি ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতেন, ধর্ম্মের নিকট স্বামী পুত্র পিতা ভ্রাতাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। দুর্য্যোধন গর্ভের সন্তান হইলেও যেদেশে জননীর মুখ দিয়া আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে 'যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়' বাক্য বাহির হইয়াছিল, সেই দেশেরই মেয়ে তোমরা! পূর্ব্ব গৌরব কি বিস্মৃত হইয়াছ! মনে কি পড়ে না সে সব কীর্ত্তি কাহিনী—গৌরবে কি বুক ভরিয়া উঠে না! ধমনীতে ধমনীতে কি শক্তির সঞ্চার হয় না! কত শক্তি যে তোমাদের অন্তরে নিহিত আছে তার সংবাদ তো তোমরা জাননা! তোমাদের দেশ তো ভোগ বিলাসের দেশ নহে, তোমাদের দেশ যে ভক্তি প্রেম ও পুণ্যের দেশ! শিশুকাল হইতে ব্রত নিয়মাদির সংযম ও ত্যাগের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়া যে শক্তির সঞ্চয় হইয়াছে তাহার বিকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই দেশের প্রত্যেক কার্য্য ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত, প্রত্যেক কর্ম্মে নারী শক্তির প্রয়োজন। এদেশে কোন ধর্ম্ম কার্য্যই নারী শক্তির সহায়তা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। মাতার আশীর্ব্বাদ, পত্নীর সাহচর্য্য, ভগিনীর সহায়তা ব্যতীত পুরুষের শক্তি সম্পূর্ণ হয় না। এই জাতীয় যজ্ঞই বা কিরূপে তোমাদের সহায়তা ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে?

আজ দেশে যে তরঙ্গ দুকুল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে, সে স্রোতে জাতির জীবনতরী বাহিতে ভারত নারীর সমগ্র শক্তির সহায়তার প্রয়োজন। জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া বিপদ বাধা অগ্রাহ্য করিয়া, নিন্দা অপমানকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া আজ ভারত নারীকে অগ্রসর হইতে হইবে।

তবে এস ভারতের মাতৃজাতি! ফলাফল শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া কর্ম্ম সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িবে এস! তোমার আর ভয় কি? পতি পুত্র যে পথে গিয়াছেন, সে পথ তো তোমার চিরপরিচিত পথ, তোমার ঈপ্সিত পথ! এস শক্তিরূপিনীগণ! পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে এস, শব সাধনার শক্তি সঞ্চার করিবে এস! যাহারা এখনও

নিদ্রিত তাহাদের জাগরিত করিয়া, কর্ণে সাধনার মন্ত্র দান করিবে এস! ঘরে ঘরে চরকা কাটিয়া দেশের বস্ত্র সমস্যা মিটাইবে এস! জাতীয় আদর্শের পুনরুদ্ধার করিবে এস! ঘরে ঘরে ত্যাগ ও সংযম ও পবিত্রতার শিক্ষা দিবে এস! বিদেশী শিক্ষার মোহ আবরণ দূর করিয়া ভারতবর্ষের সুপ্ত শক্তি জাগরিত করিবে এস! ভারতবর্ষের ভবিষ্যদ্‌বংশকে ধীর স্থির, অটল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ধীর করিয়া গড়িয়া তুলিবে এস!

তাই ডাকিতেছি, এসো মা! এস পত্নী! এস কন্যা! এস ভগিনি! যে মহান কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে উপস্থিত তাহা মাথায় তুলিয়া লও। জীবন সার্থক করিবার এমন সুযোগ আর পাইবে না। নিজের বিবেকের প্রতি, নিজের স্বামী পুত্রের প্রতি, নিজের জননী জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া ধন্য হও—ধন্য কর!

বাংলা ভাষার ইতিহাস

ভূমিকা

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

বাংলাভাষার ইতহাস আজও লেখা হয় নাই। স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বাংলাভাষার প্রকৃত ইতিহাস কিছু আছে কি না—সে বিষয়ে আমার মত স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরও ঘোরতর সন্দেহ আছে। অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাংলাভাষার ছোট্ট একটু "কুলজী" লিখিয়াছেন, কিন্তু বাংলাভাষার "কোষ্ঠী" লেখা এখনও পর্য্যন্ত বাকী আছে। কোন্ আচার্য্য সে কর্ত্তব্য সমাপন করিবেন, আজও তার ঠিকানা পাই না। কেবল মাত্র পণ্ডিতপ্রবর বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের History of the Bengali Language—"বাংলাভাষার ইতিহাস"—এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে কতকটা অর্থের সন্ধান দেয় মাত্র।

বাংলা ভাষার ইতিহাস জিনিসটা বুঝিতে গেলে—"বাংলা" জিনিসটা কি, "ভাষা" জিনিসটা কি, এবং "ইতিহাস" জিনিসটাই বা কি—তাহা বোধ হয়

আগেই বোঝা দরকার। "বাংলা" এবং "ভাষা"র কথা পরে। "ইতিহাস" কথাটির বেশ একটু মজার ইতিহাস আছে। সংস্কৃত— "ইতি হ আস"—"এই-ই-ছিল"—"ইহাই ছিল"—এই তিন শব্দ লইয়া "ইতিহাস" কথাটি রচিত। সুতরাং ইতিহাস লিখিতে গেলে, যেটুকু ছিল কেবল তাহাই যথাযথ বলিতে হইবে—অজ্ঞতা প্রযুক্ত কল্পনার রঙে রঙিয়ে ছবিখানি আঁকিলে চলিবে না।

বাংলাভাষার বর্ত্তমান পরিণতির ইতিহাস বুঝিতে গেলে গোড়া হইতে সব কথা আলোচনা করিতে হইবে। বাংলার সহিত ভারতীয় অন্যান্য ভাষার কি সম্বন্ধ তাহাও বুঝিতে হইবে। আবার ভারতীয় ভাষাগুলি জগতের ভাষা সমূহের সঙ্গে কি ভাবে সংশ্লিষ্ট তাহাও প্রসঙ্গ ক্রমে আসিয়া পড়িবে। তারপর আসলে "ভাষা" জিনিসটাই বা কি—তাহার স্বরূপ, পরিণতি ইত্যাদি কথা না জানিলে, বাংলার ভাষার ইতিহাস বুঝার সুবিধা হইবে না। তাই আমার আলোচ্য বিষয়কে মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করিয়া লইব।

(১) অবতরণিকা—"ভাষা" ও "ভাষাবিজ্ঞান" সম্বন্ধীয় কথা

(২) জগতের ভাষা সমূহ—

(৩) ভারতীয় ভাষা সমূহ—

(৪) বাংলা ভাষা—

আবার বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার জন্য এই চারিটি বিভাগকে নিম্ন-লিখিত ভাবে ভাগ করিয়া লইব :—

১। অবতরণিকা

১—নাম—ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান

২—ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস

৩—ভাষার স্বরূপ

২। জগতের ভাষা সমূহ

৪—জগতের ভাষা সমূহের শ্রেণী বিভাগ

৫—ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহ

৬—ইন্দো-ইরাণীয় ভাষা সমূহ—আর্য্য ভাষা

৩। ভারতীয় ভাষা সমূহ

৭—আর্য্য ও অনার্য্য ভাষা

৮—দ্রাবিড়ী ভাষা সমূহ

৪। বাংলা ভাষা

উল্লিখিত ভাবে এক সঙ্গে সুবিধামত এক বা ততোধিক বিষয় লইয়া ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। উপাদান সংগৃহীত আছে—কেবল গুছাইয়া লিখিতে হইবে। আশা করি সমস্তগুলি প্রকাশিত হইলে বাংলা ভাষার ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের অনেক সুবিধা হইবে এবং আমা অপেক্ষা যোগ্যতর ও অবসরযুক্ত কেহ এ বিষয়ের আলোচনার ভার গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার একটি প্রধান অভাব মোচন করিবেন।

বঁধু-বিরহে।

[শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্ এ, বি এল]

ওগো মোর দুখের নাহিক ওর!
মরমে পশিয়া সিঁদ-কাটি দিয়া চিত্ত হরিল চোর।
বিম্বাধরের বিভ্রম ভাবি অন্তরে বাড়ে তৃষা,
স্মরি বেণু-তান বিগলিল প্রাণ, হৃদয়ে না পাই দিশা।
নিমেষে যখন ছুটে সে স্বপন নয়নে উথলে লোর,
দুখের দহনে দহি নিশিদিন জানি না কি হবে মোর!

* *

এ মম মানসে চপলার মত চমকি পলাও আকুলি প্রাণ,
কত দিনে তব মধু-মূরতিতে দিবে দিবা নিশি দরশ দান?
কত দিনে আর আঁখি রসায়ণ
বিনোদ কিশোর ওরূপ মোহন
লুব্ধ মুগ্ধ এ দুটি লোচন
অধীর পিয়াসে নিমেষে নিমেষে চকোরের মত করিবে পান?

* *

ওহে নাথ তাপহারি!
অতি অসহন অতি অকহন
জলন্ত তব বিরহ-দহন
পশিয়া ধসিয়া নিখিল মরম চেতনা না নিতে কাড়ি
চন্দ্র-বদন-বিতানে তোমার
কর আবরিত চিত্ত আমার
সন্তাপ-হরা স্মিত-সুধা-ধারা পরতে পরতে ঢারি।

* *

ঘিরিছে আমারে একিরে বিকার!
গভীর তিমির ইন্দ্রিয়-দ্বার
করিছে বুঝিবা বন্ধ!

এ কি নিদারুণ দশা অভিনব
চিত্তে আমার আনে অভিভব,
নয়ন হ'ল কি অন্ধ ?
না হ'তে বধির শ্রবণ-বিবর
নাচুক্ তোমার মুরলীর স্বর
তুলিয়া মধুর ছন্দ ;
না নিভিতে মোর নয়নের আলো
লীলাময় ! তব লাবণ্য ঢালো
উত্তোলি মুখ-চন্দ্র !
কলঙ্ক তব ঘোষিবে ভুবন
ঘটে যদি নাথ ! দাসীর মরণ
না হেরি নয়নানন্দ !

* *

তবে কি বন্ধু আসিল ?
করুণা সিন্ধু টলিল ?
মনে কে তুলিল লহরী ?
বনে কি বাজিল বাঁশরী ?
মুরলীর রসে রসিয়া
মণি-মঞ্জীর রণিয়া
তালে তালে তুলি অগ্র চরণ
নয়নের ক্ষুধা করিতে হরণ
সমুখে কি সখা ! দাঁড়ালে ?
জনমের জ্বালা জুড়ালে !
জীবনে সুখের বাকি কি ?
বঁধু হে, খুলিব আঁখি কি ?

*

একি ! কোথা তুমি লুকালে !
কূলে আনি তরী ডুবালে ?

* *

হে মোর দেবতা! হে মোর দয়িত! ত্রিভুবনে এক বন্ধু হে!
হে রস-আধার! তৃষিত জনার করুণার সুধা-সিন্ধু হে!
হে নাথ রমণ! নয়ন-রঞ্জন! হে মোর চপল রসিক হে!
কত দিনে আর হ'বে গো আমার লোচনের পথে পথিক হে!

* *

দস্যুর মত বিরহ তাহার
দেহের সকল শকতি আমার
নিয়েছে কাড়ি,
ধরণী-শয়ন ছাড়িয়া চরণ
তুলিতে নারি!
দৈবে যদি বা এমন সময়
ভাগ্যের ধন আসে রসময়
সমুখে মোর,
বুঝিবা তাহারে না পারিবে আর
বাঁধিতে বক্ষে বিবশ আমার
বাহুর ডোর!
বঁধুয়ার মম তরুণ তরল
দেখিতে দিবে না বদন-কমল
নয়ন-লোর!

* *

বুঝি এ জীবনে এ পোড়া নয়নে ঘটিল না দরশন!
পরজনমের কঠোর সাধনে
পাব কি দেখিতে কমল-বদনে
ভরি মোর দুনয়ন!
মুখ-পঙ্কজ কি বা সুন্দর
অরুণ অরুণ ওষ্ঠ অধর
হাসিটি লাগিয়া তায়,
সে অধর সুধা বহে বেণু-গান
শ্রবণে গগন ভুবন পরাণ
হরষে গলিয়া যায়!

আধ-বিকশিত বিলোল লোচন
বিভ্রমভরে ভুলায় ভুবন
পরাণ বিকাতে চায়!
এমন মাধুরী যুগে যুগে ঘুরি কভু কি দেখিব হায়?
লীলায় চপল রসেতে শীতল কমললোচন কি বা!
নীল তারা তায়, প্রান্তে লুটায় উষার অরুণ বিভা।
ঘুরায়ে ঘুরায়ে সে দুটি নয়ন
করুণ কিশোর হেরিবে বদন—
উদিবে কবে সে দিবা?
বহুল চাঁচর চিকুর মাথে
বাঁকা শিখি পাখা চূড়াটি তাতে,
চপল চপল লোচন কি বা
বিম্ব জিনিয়া অধর-বিভা
মৃদুল মৃদুল তরল হাস
বঁধুর মধুর বেশ বিলাস
মন্দার সম মথিয়া মন
ধৈরজ- ধন করে হরণ!
হা হা বঁধু! মধু-মাধুরী তোর
ঢুঁড়িছে পাগল নয়ন মোর!

* *

সে যে রে চতুর চোর!
নীরদ-কান্তি, মরাল-গমন,
খঞ্জন-মীন-হারণ-লোচন
চন্দ্র বদন-মাধুরী মোহন
হরিল বঁধুয়া মোর!
মধুর মধুর তাহার বদন—
মাধুরীতে যবে মগন নয়ন
সেই অবসরে চুরি করি মন
লুকাল কিশোর রাজ;

কত দূরে আর করিবে গমন ?
দয়িতার আঁখি করিতে স্মরণ
অলস চরণ জড়ের মতন
দাঁড়াবে কানন মাঝ !
যদি দূরে যায়, ময়ুর-মুকুটে
পড়িবে সে ধরা নয়নের পুটে,
কেমনে গোপন রবে,
আঁধিয়ার বনে অঙ্গ কিরণে
বঁধুরে চিনিব সবে !

সুখের ঘরগড়া

পঞ্চদশ অধ্যায়

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

মাণিক বাহিরে আসিয়া বরাবর জীবন ভট্টাচার্য্যের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। জীবন তখন ইশেন হালদারের সঙ্গে কি কথায় ব্যাপৃত ছিল। মাণিক গিয়া সমস্ত ইতিবৃত্তান্ত জীবনের কাছে জানাইল। জীবন বেশ একটু মুরুব্বীয়ানা ধরণে হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিতে যাইবে এমন সময় তর্ক সিদ্ধান্ত বাড়িতে আসিয়া হাজির। মাণিককে দেখিয়া বলিলেন, "কি হে মাণিক ও বাড়ী পুজা সেরে এলে ?

মা। আজ্ঞে না ! গিয়ে দেখি আপনার ভাগ্নে কাজ সেরেছেন—

ত। কেন ? তুমি যাওনি ?

মা। আজ্ঞে যেতে দু চার মিনিট দেরী হয়েছিল বৈতো নয় ; তবে কিনা আমাদের মত পুরুতের কাজে কি ওঁদের মন উঠ্‌বে—' আপনাদের মত পণ্ডিত পুরুৎ যদি ওরা পায় তা হলে আর— ।"

তর্ক সিদ্ধান্ত মাণিকের এই অপ্রত্যাশিত বাকপটুতায় অবাক হইলেন। মাণিক তর্কসিদ্ধান্তের ছেলের বয়সী। তাহারি টোলে সে কয়েক দিন মুগ্ধবোধ মুখস্থ ও স্মৃতির বুকনি সংগ্রহ করিয়াছিল ; কিন্তু সরস্বতীর অকৃপা বশতঃ

ব্যাকরণ বাগ মানিল না, এবং স্মৃতি বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়িল, কাজেই এ বালাই ছাড়িয়া দিয়া সে খুড়ার কাছে নিত্য পূজাপদ্ধতির কয়েকটা কাজ চালান মন্ত্র তন্ত্র শিখিয়া নিয়া কৌলিক পৌরহিত্যের পেশা ধরিল; বাকী সময়টা ঘুনী ও জাল বোনা শিখিয়া মৎস্য বধ কার্য্যে ব্যয় করিত। মাণিকরাম তর্কসিদ্ধান্তকে যেমন সবাই ভয় ভক্তি করিত, তার অধিক ভয় করিত, ভক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। কারণ ছাত্রাবস্থায় সে সিদ্ধান্ত হাতে প্রাপ্রান্ত ভৎ'সনা লাভ করিত। এই মাণিকরামের মুখে ইদৃশ বিদ্রূপ রসাত্মক বাক্য শুনিয়া সিদ্ধান্ত মহাশয় সত্যই স্তম্ভিত হইলেন।

তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না কোন খেলোয়াড়ের যাদু মন্ত্রে হেলে শাপ ফনা তুলিতেছে। এক অসহায়া বিধবাকে তাঁহার দেবী দুর্লভ গুণের জন্যই যে কুচক্রী পাঁচ জনের হাতে অকারণে এমন বিপন্ন হইতে হইতেছে ইহা ভাবিয়া তাঁহার ব্রহ্মণ্য রোষ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ঘৃণায় তাঁহার ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইল। তার পর একটা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন "ভেলারে মাণিকরাম, কে বলে মাণিক কথা কইতে জানে না।" তারপর তিনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। তিনজনেই কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ষোড়শ অধ্যায়—

ভোলানাথ গত দিন অপরাহ্ণে একটা ভাসা ভাসা রকমের গুজব শুনিয়াছিল যে চৌধুরী মহাশয় নাকি ব্রাহ্মণদের ডাকিয়া বলিয়াছেন সে ভোলানাথের মেয়ের ভাতে সকলেরই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিৎ। তাহার একটু আশ্বাস হইয়াছিল, কেননা সে কোন এক সময়ে লুকাইয়া গিয়া জমিদার রতনরায়ের শরনাপন্ন হইয়া তোষামোদ ও অনুনয় বিনয় করিয়া ধরিয়াছিল এ সংকটে তাহাকে বিপন্না না করা হয়। রতনরায় স্তবে তুষ্ট হইয়া ভোলাকে অভয় বর দেন। ফলে চৌধুরীও তস্য মনিবের গোপন পরামর্শে স্থির হইয়াছিল যেভোলানাথ রূপ নিরীহ মেষ অবধ্য, রায়সিংহের ক্রোধ যোগ্যই নহে। যত দোষ ওই কুটিল-মতি দুর্ব্বাসারূপী তর্কসিদ্ধান্তের। উহাকে যেন তেন প্রকারেণ জব্দ করিতেই হইবে। আর ভোলানাথের ভ্রাতৃদ্বয়ের অহিন্দু আচরণের জন্য তাহাকে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে তার যথাযোগ্য মর্য্যাদার মূল্য স্বরূপ অগ্রিম ধরিয়া দিতে হইবে। তবে তর্কসিদ্ধান্তের সম্বন্ধে এই যে মৎলব তাহার সফলতা সাধনে ভোলাকে সাহায্য করিতে হইবে এই সত্ত্ব—ভোলানাথকে উপস্থিত সংকট

হইতে উদ্ধার করা যাইবে, এ কথা তাহাকে বঝান হইল। ভোলানাথ স্বভাবে কাপুরুষ ও প্রবলের আশ্রয় পরায়ণ, গ্রামে তার মত ক্ষীণপতঙ্গকে যে প্রবল প্রতাপ আশ্রয়দাতার রোষবহ্নিতে পড়িলে মুহূর্ত্তে ভগ্ন হইতে হইবে এ ভয় তাহাকে সর্ব্বদা আড়ষ্ট করিয়া রাখিত, অথচ এই ভয় ও কাপুরুষতা সে মেয়ে মহলে জানাইতে পারিত না; বিশেষ যখন তাহারই আত্মীয় একজন অনাথা অবলা বিধবা তাঁহার মনের দার্ঢ্য ও তেজ এমন ভাবে দেখাইতেছেন তখন তাঁহার কাছে নিজ দৈন্য প্রকাশ হইতেই পারে না। ভোলা সম্মত হইল, তবে সাক্ষাৎ ভাবে কায়বাক্যে সে তর্কসিদ্ধান্তের শত্রুতা করিবে না; তবে বন্ধুত্ব করিবেন না ইহা সে প্রতিজ্ঞা করিল; তাহার মৌন সম্মতি ও নীরব ব্যবহার যতটা পারে ব্রাহ্মণের অ[illegible] করুক তাহাতে তাহার আপত্তি নাই।

ভোলার প্রতি রতনরায়ের এই ক্ষমাপ্রদর্শন মহেশের মনোগত ইচ্ছানুকূল ছিলনা; তাহার কারণ সে ভোলানাথকে জব্দ করিতে চায়। উদ্দেশ্য গভীর। তারামণির প্রতি মহেশের যে জঘন্য অভিসন্ধির আভাষ আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি তাহাই ইহার মূল। মহেশের মনে মনে বিশ্বাস ভোলানাথ তারামণির প্রতি গোপনে গোপনে আসক্ত; এই আসক্তিকে আলোচালের নৈবেদ্যের উপর ভেড়ার লোভদৃষ্টি রূপে সে একবার ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করে। মহেশ একবার কথায় কথায় ঈর্ষ্যাপ্রাবল্যফলে ভোলাকে ঠারে ঠোরে ঐ বিষয় লইয়া তামাসা করে; ভোলা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করে। তদবধি মহেশের মন কতকটা সুস্থ হইলেও সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক হয় নাই। মহেশ এরূপ একটা ধারণাও ভোলার মনে জন্মাইয়া দেয় যে তারামণি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠেরই কাম্য বস্তু, তাহাতে সামান্য ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা লোভীর পক্ষে প্রমাদকর। ভোলানাথ না বুঝিয়াও বুঝিবার ভাণ করে।

সম্প্রতি পূর্ব্বদিনের রাত্রিতে এমন এক ঘটনা ঘটে যাহাতে মহেশের পূর্ব্ব ঈর্ষ্যা প্রবলতর মাত্রায় জ্বলিয়া উঠে। ঘটনাটা সামান্য। কিন্তু ঈর্ষ্যার মন তুচ্ছকে ফাঁপাইয়া তিলকে তালে পরিণত করে। যজ্ঞবাড়ীর তরকারী কুটিবার জন্য তারামণি মনিব বাড়ী হইতে রাত্রি ৮টার সময় ছুটী করিয়া কোলের ছেলেটী লইয়া ভোলানাথের বাড়ী আসে। রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কুটনা কুটিয়া আর বাড়ী না ফিরিয়া সে যজ্ঞেশ্বরীর কাছেই নিদ্রা যায়। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সে ভোলানাথকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আসে।

...দৈবের ঘটনা রোধ করে কে? মহেশ চৌধুরী সেই পথ দিয়া নিকটবর্ত্তী

তালিবপুর গ্রামের কাছারী পরিদর্শন করিতে যাইতেছিল। দুজনের চোখোচোখি হইল। মহেশ একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল "একি হে মাষ্টার! কোথায় চলেছ?" হাসির অর্থ ভোলানাথ যে বুঝিলনা তাহা নহে, অপরাধ না করিয়াও তাহাকে যে অপরাধীর মত জবাব দিহি করিতে হইবে ইহাতে সে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল "তারামণি কাল আমাদের বাড়ীতেই ছিল, কুটনো বাটনা করতে রাত হয়ে যায় কাজেই বাড়ী ফিরতে পারেনি আজ তাই পৌঁছে দিতে চলেছি।" "তাইনাকি? তা মন্দ না ভাল ভাল"— বলিয়া মহেশ চলিয়া গেল। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটা ভোলানাথকে ভালরকমই বিঁধিল। সে একটা অনির্দ্দেশ্য ভয়ে মুখ ফিরাইয়া পিছনে তাকাইল; দেখিল মহেশও তাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেছেন।

মহেশের পাপের মন; সন্দেহটা এই দৈবদৃশ্যে আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল; বাড়ী ফিরিয়াই সে জীবন ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া সকালের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। আগুন উঠিলে বাতাস তাহার সহযোগী হয় এবং রাজ্যের খড়কুটো উড়াইয়া আনিয়া তাহাতে ইন্ধন যোগায়। সহচরটী মহেশের সন্দেহটাকে পাকাইয়া তুলিল। "বলেছিতো পিসেবাবু মাষ্টার ডুবে ডুবে জল খাবার একজন! সাহস বটে বাবা"। বন্ধুর উৎসাহে ভোলানাথের প্রতি মহেশের পূর্ব্বে জিঘাংসা দ্বিগুণ বলে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে যে ইহার সমুচিৎ ফল দেওয়া উচিৎ তাহা দুই জনেই স্থির করিল। তারপর সেদিন জীবন ও ঈশান যখন অপমানিত মাণিকলালকে লইয়া মহেশভবনে উপস্থিত হইল এবং মাণিকের ইতিবৃত্ত মহেশকে শুনাইল তখনই মহেশের মাথায় ভোলানাথ এবং তর্কসিদ্ধান্তরূপ দুই পক্ষীকেই এক ঢিলে মারিবার ফন্দী জুটিয়া গেল। জমীদারী চালানো মাথার উর্ব্বরতা মহেশের যথেষ্ট ছিল। মাণিকের এই অপমান প্রতিশোধচ্ছলে যে তাহা সহজে সিদ্ধ হইতে পারে মহেশ পার্শ্বচর দুটীকে জলের মত সরল করিয়া বুঝাইয়া দিল।

ঘটনা শুনিয়াই চৌধুরীর মুড়া অর্দ্ধপক্ক গোঁপের আড়ালে একটা হাসির বাকা রেখা খেলিয়া মিলাইয়া গেল। কয়েক মিনিট কি একটা ফিস্ ফাস্ করিয়া চৌধুরী বলিলেন—"চলহে ভট্চাজ ফলার খেতে যাই। ভোলা আমাকে এস্‌পেশাল নেমন্তন্ন করেছে—"। পিসেবাবুর আশ্রিত বাৎসল্য দেখিয়া ঈশান ও জীবন মুগ্ধ হইয়া গেল।

যথাকালে দু এক জন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোলানাথের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত

হইল। প্রত্যেকেরই সঙ্গে ছেলে মেয়ে আধডজন করিয়া। এমন কি দুতিন বছরের দুগ্ধ পোষ্যও বাপ ভাই মামা মেসোর কাঁধে ও কোলে চাপিয়া আসিতে ছাড়িল না।

নবীন চক্রবর্ত্তী ও হৃদয় গাঙ্গুলী সর্ব্বাগ্রে আসিয়া আসর জমকাইয়া তামাকের শ্রাদ্ধ করিতেছিল। মাণিকের অপমান কাহিনী দাবাগ্নির মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; নবীন ও বিজয়ও তা অবগত হইয়াছিল। জয়রাম চাটুয্যে আসিয়া সেই কথা উত্তাপন করিল। জয়রাম মাণিকের পৃথগান্নভোজী খুড়তুতো বড় ভাই; ইনিও ভোলানাথের পুরোহিত। বৎসরে ছয়মাস ইহারা করেন যজমানী, বাকী ছয়মাস করে মাণিকরাম। মাণিকের যজমানী হাত ছাড়া হইলে উঁহারই সে কাজ লাভ হইবে এই তার গোপন আশা—কিন্তু তর্কসিদ্ধান্ত যদি সেই পাকা ফলে লোভ বসান তাহা হইলে সমূহ আশঙ্কা; এই জন্যই সে ব্যাপারটার অধিক খবর জানিতে নবীন ও বিজয়ের শরণাপন্ন হইল। জ্ঞাতিশোকসুলভ আনন্দ চাপিয়া মৌখিক দুঃখ ও আক্রোশ জানাইয়া বলিল—"তোমরাই বিবেচনা করে দেখ ভায়া, উনি হলেন একজন দিগ্‌গজ। পণ্ডিত, উনি যদি আমাদের মত গরীব গুর্ব্বার অন্ন মারতে বসেন বিবেচনা কর তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথা"—নবীন ডাবা হুকায় গুনুমন নিয়োজিত করতঃ ধুম্রলোক রচনা করিতে করিতে নালিশ শুনতেছিল জয়রামের কথা শেষ হইলে একটা প্রচণ্ড বেদম সুখ টান টানিয়া বাহাতে হুকার মুখ মুছিয়া ডাইন হাতে উহা জয়রামের দিকে আগাইয়া দিয়া বালল—"অবিশ্যি, তা আর ভুল কি! ওটা কি ওর জুগ্‌গি কার্য্য হল শাস্ত্রেই বলেছে যস্ত নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞং মিত্র উক্তং ন করোন্তি য স এব নিধনং যাতি যত্র মন্থর কৌলিক।" তখন বলেছিলাম মাণিক বাবাজী একটু ল্যাখাপড়া শিখে পিতৃমুখ উজ্জ্বল করো বাবা চাপে কাটার চেয়ে ধারে কাটা ভাল—তা বিদ্যালাভ না করে পুরুহিত্য কার্য্য বড় কঠিন—তা আমিতো বলি এর একটা বিহিত হওয়া উচিৎ ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ এর অপমান হওয়াটা ভাল কি?

রিদয় টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"নিশ্চয়ই মা—স্বজাতি হল মাণিক, পরাণ বিশ্বেলংকারের বেটা তাকে ফেলে এ বাড়ীতে পাতা পাতা কি আমাদের উচিৎ সে বোধ হয় আসছেনা খেতে— জয়রাম ধুম ছাড়িয়া বলিল কি করে আসে বল, বিবেচনা কর আত্মসম্মান তো ভাসিয়ে দিতে পারে না? আমরা না হয়—নবীন বলিল "এসেছি যে সে শুধু রাজাদিষ্ট অমান্যকর করতে

পারিনি বলেইতো নচেৎ কিনা ফলারের লোভে—অবিশ্যি কিনা রিদয় ভায়া ?”

এইরূপ আলোচনা চলিতেছে এমন সময় তথায় মহেশ চৌধুরী ইশান ও জীবন আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরো জন ২০।২৫ ব্রাহ্মণ পুঙ্গব আসিয়া পড়িলেন। চৌধুরী মহাশয়কে দেখিয়া নবীন ও জয়রাম পরম উৎসাহে সমস্ত ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিল। সভাস্থ সকলেই শুনিল ও জানিল ব্যাপার খানা কি। মহেশ কিয়ৎক্ষন গম্ভীর থাকিয়া বলিল “মানিকরাম আসেনি ?” সকলেই সমস্বরে বলিল “না না”। এ ক্ষেত্রে কি তার আশা কর্ত্তব্য বলেন বিবেচনা করুন অসম্মানটা কতদূর আবার মুখুজ্যে গিন্নি না কি বলেছেন যে চালকলা বাঁধার ব্যবসাদার বাউন তুমি তোমার কথা আলাদা—”। মহেশ ভোলানাথের খোঁজ করিল। ভোলানাথ অন্তরালে দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত ভাবে অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিল। মহেশের কথায় সভায় উপস্থিত হইল।—মহেশ বলিল কি হে মাষ্টার! আবার কি কেলেঙ্কারী করে বসেছ ?” আমি করি না কপালে করে চৌধুরী মশাই যা বলুন! এখন আমিই দোষী।”খুবই একটা তর্কাতর্কি কথা কাটাকাটী হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ভোলানাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! মাত্র আধ ঘণ্টা আগে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদলের আগমন দেখিয়া ভোলানাথ ও যজ্ঞেশ্বরীর খুব সাহস ও আশ্বাস বাড়িয়াছিল এবং উভয়ে পরম উৎসাহে কাজ করিতেছিল, কিন্তু এই আকস্মিক উৎপাতে ভোলানাথ বিলক্ষণ দমিয়া গেল। তাহার মনে হল আসন্ন ঝটিকার সূচনা স্বরূপ দিগন্তে একটা কালো-মেঘ মাথা উঠাইয়া উঠিতেছে। একটা যে গুরুতর কিছু না ঘটিয়া দ্বিবাবসান হইবে না এই ভয় দেবর ভাজকে পাইয়া বসিল। যজ্ঞেশ্বরী……বাহিরের কোলাহল শুনিয়া চণ্ডীমণ্ডপ ঘরের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা বুঝিলেন; সঙ্গে দক্ষ ঠাকুরাণী ছিল। উভয়ে বাড়ীর ভিতর গেলে দক্ষ ঠাকরুণ বলিলেন “কিছু না বৌমা! ও ওই বিটলে বাউনের একটা চাল্। মান্কের সাহস কি বৌমা কি যজমান চটায় ? শিবের মাথায় চাপ্‌লে ঢোড়াও ফণা ধরে।” দক্ষ দেবী খুব চতুরা এবং ক্ষেত্র বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে খুব মজবুৎ। তিনি খিড়কী দিয়া ছুটিয়া গিয়া তর্কসিদ্ধান্তকে খপর দিলেন; সিদ্ধান্ত সেই মাত্র পুজা সমাপন করিয়া উঠিয়াছেন দক্ষ প্রমুখাৎ ব্যাপার শুনিয়া সেই বেশেই অকুস্থানে হাজির হইলেন; পঞ্চুও মামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত।

আর একজন আসিতে ইচ্ছুক হইয়াও আসিতে পারিলেন না; ভবানী প্রসাদ! ভবানী ঘণ্টা খানেক আগে আসিয়া বিজয়ের সহিত বাটীর ভিতরেই তার শয়ন গৃহে বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। বাহিরের ঘরে তেমন বসাইবার ভাল স্থান না থাকাতেও বটে আর তিন বন্ধুতে মিলিয়া নির্জ্জনে আলাপ পরিচয় করার ইচ্ছাতেও বটে বিজয় তাহার শয়ন ঘরে শয্যায় ভবাণীকে বসাইয়া আলাপ সম্ভাষণ করিতেছিল। যে সময়ে গোলমালটা ঘটে তখন ভবানী জলযোগ করিতেছিল; বিজয় বিজয়ের মা নাছোড়বন্দা হইয়া তাহাকে ও পঞ্চুকে জল খাওয়াইতে রাজী করেন; পঞ্চুর তখনো স্নান না হওয়াতে সে বাড়ী যায়; বিলম্ব হইবে বুঝিয়া ভবানীকে অগ্রিম কার্য্য সম্পাদন করিতে বলিয়া যায়। ভবানী তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিতে লাগিল। সে দলাদলি ব্যাপারটা পূর্ব্বেই কিছু কিছু নয়নতারার কাছে শুনিয়াছিল।

হাফিজের কাব্যরহস্য

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এ ম্ এ]

বি নামেহ্‌ম্ নিশানে জে জামেলে দস্ত্ লেকিন্

দো জাহান্ বাহম্ বার্ আয়াদ্ শের্-ই-শোর্-ও শার্ নাদারম্॥

আমি আমার প্রিয়তমের সৌন্দর্য্যের কণা মাত্র দেখাইতাম কিন্তু ভয় হয়—পাছে দ্যুলোক ভূলোক আত্মহারা হইয়া পড়ে! (আমি তোমাকে একটা আভাস—একটা ছবি দেখাইতে পারি, কিন্তু তার সৌন্দর্য্যালোক সহ্য করিতে পারিবে কি?)

১

আদর্শ কবিতার লক্ষণ সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলকে প্রকাশ করা। সমস্ত ললিত কলারই ঐ এক আদর্শ। স্থাপত্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত কবিতা মনের গোপন ভাবটীকে আকার দিয়া চির স্থির করিয়া রাখিতে চায়। মানব জীবনের যেমন তিন অবস্থা, আদর্শ কবিতাও তেমনি তিনটী সোপানের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করে,—শৈশব, যৌবন ও পরিণতবয়স

প্রথম অবস্থায় বা শৈশবে কবিতা সরল ও নীতিমূলক হইয়া থাকে। এই জাতীয় কবিতায় যুগধর্ম্মের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের সাধনা বেদের সরল মন্ত্রগুলির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সভ্যতার প্রথম যুগে এই জাতীয় কবিতা শৌর্য্য, বীর্য্য, সহিষ্ণুতা, মহত্ব প্রভৃতি মানবীয় সদ্‌গুণগুলির পূজাতেই অনুপ্রাণিত! ইস্‌লাম ধর্ম্মপ্রচারের পূর্ব্ববর্ত্তী স্যামুয়েল ও পরবর্ত্তী রোদাকি, আন্‌সারি এবং কির্দ্দুশী প্রভৃতি পারসী কবি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কির্দ্দুশী একটী সরল কবিতায় বলিতেছেন—

খুদাওয়ান্দে বালা ওয়া পস্তি তু-ই।
নাদাণাম্ চে-ই, হার্চে হস্তি তু-ই॥

(হে দেবতা, তুমি উচ্চে আকাশের রাজা, নিম্নে ধরণীর রাজা। জানি না, তুমি প্রকৃত কে, কিন্তু তুমি যে-ই হও, আমি শুধু এই মাত্র জানি যে তুমি আছ)। সারল্যে সুন্দর, অভিব্যক্তিতে স্বচ্ছ এই ক্ষুদ্র কবিতাটী নীতিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে জীবন গঠনেরও একটা ক্ষীণ আভাস দিয়া যায়।

দ্বিতীয় যুগে বা যৌবনে এই কবিতা সভাবতঃই জটিল ও সৌন্দর্য্য-রস-সম্পন্ন হইয়া থাকে। তখন ইহা আপনার মাঝে আপনি পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, ভাষাসম্পদে ও বর্ণনা-লালিত্যে তখন ইহা স্ফুটনোন্মুখী কিশোরীর ন্যায় অলঙ্কার বাহুল্যে পীড়িতা রূপকে ও কল্পনায় তখন ইহা মাধবী পূর্ণিমার ন্যায় আবেশময়ী। প্রথম যুগের কবিতা যেমন আমাদের প্রাথমিক আশা, আকাঙ্ক্ষা ও নৈতিক জীবনের প্রভাব বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত হয়, দ্বিতীয় যুগের কবিতা প্রধানতঃ আমাদের অন্তর-দ্বারে করাঘাত করিয়া সুপ্ত বাসনারাজি জাগাইয়া দেয়, জীবনের যামুন-প্রবাহে উজান বহাইয়া দেয়। মরণের মধুর স্বপ্ন চক্ষের পল্লবে শিশির-কণার মত মাখাইয়া দেয়। জয়দেবের ভাষায় এই শ্রেণীর কবিতা 'মৃগমদ-সৌরভ-রভসে' মহিমময়ী। প্রথম যুগের কবিতা অপেক্ষাও এই যুগের কবিতা আদর্শে গরীয়সী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার আদর্শ মুক্তার মত শুক্তি-গর্ভে আচ্ছন্ন ও প্রসুপ্ত বটে, কিন্তু সে শুক্তির কঠ-আবরণ শঙ্খ-ধবল ও মসৃণ। এই আদর্শেই দান্তের সুবর্ণ-স্বর্গ ও অন্ধকারময় নরক গঠিত হইয়াছে, আবার ইহারই আদর্শে সাদি, আনওয়ারি, সুল্‌মান্ সোরাজি প্রভৃতি সৌন্দর্য্য—রসিক পারস্য কবিগণের ললাম কল্পনা মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে।

তারপর তৃতীয় যুগ—বা কবিতার উচ্চ পরিণতির কথা।

কবিতা তখন গুণ ও অধ্যাত্মমূলক হইয়া পড়িয়াছে। ইহা তখন যথার্থ আদর্শ খুঁজিয়া পাইয়া মাটীর বাঁধন নির্ম্মোকের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছে। আপন সত্তা ও পৃথিবীর চতুঃসীমা ছাড়াইয়া তখন ইহার প্রভাব বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। স্বর্গের অমর মহিমার পানে ইহা ভ্রূক্ষেপ করে না, পূজা পদ্ধতির প্রাণহীন ধর্ম্মে ইহা আপনাকে ধরা দেয় না ঈর্ষ্যা-নিন্দার কুটিল কটাক্ষে ইহা সংকুচিত ও অবনত হইয়া পড়ে না। সুতরাং এই শ্রেণীর কবিতার ও কবির সংখ্যা অনেক পরিমাণে কম। কিন্তু সেই অল্প সংখ্যক কবির প্রত্যেকেই সত্যদর্শী, ঋষি-কল্প ও যথার্থ কবি। কবিতা তাঁহাদের হৃদয়ের ছায়াচিত্র, মস্তিষ্ক প্রসূত শুষ্ক সিদ্ধান্ত মাত্র নহে। কবিতা তাঁহাদের ভাষাভাবের, ধ্যান ধারণার প্রকৃষ্ট পরিচয়। সেই জন্যই এ শ্রেণীর কবিতার পাঠক সংখ্যাও খুব অল্প। এই শ্রেণীর কবির মধ্যে জগতের শিক্ষক মহম্মদের জামাতা আলি, সাম্‌স্‌তাব্‌রেক, মৌলানা জালালুদ্দীন্ রুমি, হাকিম সানাই, জামি, ফারিরুদ্দীন্ আট্টার্, ও এই প্রবন্ধের আলোচ্য কবি শেখ আব্‌দুল্ কাদির্ জিলানি হাফিজ, বা খাওয়াজা সাম্‌সুদ্দীন্ মহম্মদ-ই হাফিজ-বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। ইহাদের কাব্য-ভাণ্ডার অফুরন্ত,—ইহাদের দর্শন-বাদ মরণের ভবিষ্য আঁধারে কুহেলি-সমাচ্ছন্ন নহে। যদি প্রথম যুগের কবিতা দুগ্ধ বা মধু-ধারার সহিত এবং দ্বিতীয় যুগের কবিতা মদিরার সহিত উপমেয় হয়, তাহা হইলে বলিব—তৃতীয় যুগের কবিতা সঞ্জিবনী সুধার সহিত উপমেয় প্রথম যুগের কবিতা আমাদিগকে আনন্দ ও নীতিশিক্ষা দেয়, দ্বিতীয় যুগের কবিতা আমাদের মনে প্রেম ও প্রীতির উন্মেষ করে আর তৃতীয় যুগের কবিতা আমাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়। ঘরের বাঁধন তখন আর আমাদিগকে বাঁধিতে পারে না ; জীবন রহস্যের সমাধান তখন সহজেই হইয়া যায় ; সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের শান্তিচ্ছায়া তখন 'ঘন শ্রাবণ মেঘের মত' রৌদ্রদগ্ধ জীবনের উপর 'রসের ভারে নম্র নত' হইয়া পড়ে। হাফিজের দুইটী গজলের দ্বারা আমরা তৃতীয়োক্ত শ্রেণীর কবিতার প্রকৃতি বিশদ করিয়া দিব ;

খুর্‌রম্ আন্ রোজ্ কাজিল্ মঞ্জিল্, উইরন্ বিরাওয়াম্।
রহ্‌তে জান্ তালাবাম্ ওয়াজ্ পৈ জানাম্ বিরাওয়াম্॥
বা হাওয়া দারি-ই-উ জারবা শিফ্‌ৎ রাক্‌স্ কুনান্।
তালাবে চাশ্‌মি মুর্শিদ্ দারাক্ষান্ বিরাওয়াম্॥

(যে দিন আমি এই নির্জ্জন পান্থ-নিবাস ত্যাগ করিব, কতদূরে সেই দিন

—কতদূর সেই দিন, যখন আমি পরম সুখে আমার প্রিয়তমের পানে ছুটিয়া যাইব—যখন তাঁহার ভালবাসার আলোকে মুগ্ধ হইয়া সূর্য্যকিরণে ধূলিকণার মত ভাসিতে ভাসিতে আমি সেই উজ্জল সূর্য্যের নিকট পৌঁছিব!) বিরহ প্রতীক্ষায় উদ্বেগাকুল কবি ভগবানের পদে আত্ম নিবেদন করিতেছেন; এইখানে বৈষ্ণব-কবি বিদ্যাপতির সেই অমর শ্লোকটী মনে পড়ে—

"এখন তখন করি দিবস গোঁয়ায়নু
দিবস দিবস করি মাসা,
মাস মাস করি বরিখ গোঁয়ায়নু
ছোড়নু জীবনক আশা!
বরিখ বরিখ করি সময় গোঁয়ায়নু
খোয়নু এ তনু আশে—"।

আমাদের মনে হয়, প্রেমের সখীও দাস্যভাব ইহা অপেক্ষা সহজ সুন্দর হইতে পারে না। অন্য একটী শ্লোকে হাফিজ্ নিরর্থক পূজাপদ্ধতি ও সমাজ শাসনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—

কাশ্‌মি গোইম্ ও আজ্ গুফ্‌তি খুদ্ দিল্‌শাদাম্।
বন্দী ইশ্‌কোয়াম ও আজ্ হার্দো জাহান্ আজাদাম্॥
নিস্ত্ বার্ লোহি দিলম্ জুজ্ আলিফ্ কোয়ামাৎ-ই-ইয়ার।
চেকুনম্ ইর্‌ফ-ই-দিগর ইয়াদ্ নাদাদ্ উস্তাদাম্॥

(মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আনন্দের সহিত বলিতেছি—আমি ভালবাসার বন্দী এবং উভয় লোক-স্বর্গ ও মর্ত্ত-হইতে মুক্ত।—আমার প্রিয়তমের মূর্ত্তির আলিফ্ (প্রথমাক্ষর) ছাড়া আমার হৃদয় পটে আর কোন অক্ষর লেখা নাই। ওগো, আমি কি করিব—আমার শিক্ষক যে আমায় আর কোন অক্ষর শেখান নাই!)

কবিতার স্তর পরম্পরায় হাফিজের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া এইবার আমি তাঁহার কাব্যালোচনা করিব।

২

সিরাজ্ দেশের কোকিল হাফিজের সঙ্গীতরাজি চিরন্তন আনন্দের উৎস; তাঁহার কবিতা কেবলমাত্র পারস্য সাহিত্যের বা পারস্যভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিজস্ব নহে, পরন্তু তাহা কবিতামোদী ব্যক্তি মাত্রেরই উপসেব্য। সমস্ত যুগের ও সমস্ত দেশের কবিত্বশক্তি হাফিজের মায়াদণ্ডে যেন উজ্জীবিত হইয়া উঠে।

এক কথায় তিনি জগতের কবি। তাঁহার গানের মধ্যে যে ভাব ও রস প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, তাহা অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করিলেও অক্ষুণ্ণ ও সুন্দর থাকিবে বটে, কিন্তু অনুবাদ কাব্য সৌন্দর্য্য, ভাষা ও ঝঙ্কারের সৌন্দর্য্য অনেকটা নষ্ট হইয়া যাইবে। অনুবাদ কেবল মূলের মোট ভাবটী বহন করিতে পারে, মূলের মূর্চ্ছনা কেমন করিয়া দেখাইব? কেমন করিয়া হাফিজের গজলের প্রেম-কম্পিত বিরহ-ব্যাকুল সুর ফুটাইয়া তুলিব? ইরান্‌দেশের আঙ্গুর বাগান, আপেল ও ন্যাসপাতি-কুঞ্জ, বুলবুলের হৃদয়দাহী গুঞ্জন, সাইপ্রেশ্‌—লতার সুকুমার সৌন্দর্য্য, খর্জ্জুর বৃক্ষের চারিদিকে সেই সন্তপ্ত পবন, ভারবাহী উষ্ট্রের সেই জীবন-ভার নামাইবার ক্লান্ত ভাবটী—কেমন করিয়া অনুবাদে জাগাইয়া তুলিব? 'বাহারে'র বা বসন্তের প্রাণোন্মাদী সৌন্দর্য্য, যৌবন-দৃপ্তা সাকীর হস্তে সিরাজির পূর্ণ পেয়ালা, বিরহিনী নারীর প্রেম-মহিমা কেমন করিয়া অনুবাদের বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশিত হইবে? তবে যে আরবী বয়েদ্‌টী আমি এই প্রবন্ধের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়া বলিব, "আমি তোমাকে একটা আভাস—একটা ছবি দেখাইতে পারি, কিন্তু তার সৌন্দর্য্যালোক সহ্য করিতে পারিবে কি?" হাফিজ কেবল ভাবসম্পদেই ধনী নহেন, বর্ণনা-লালিত্যেও তিনি অনিন্দনীয়; তাই বলিতেছিলাম, যে অনুবাদে তাঁহার কাব্য-সৌন্দর্য্য অনেকাংশে ব্যাহত হইয়া যাইবে।

কলাবিৎরূপে হাফিজকে উপস্থাপিত করিয়া তাঁহার গুণাবলী নির্দ্দেশ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কবির সম্বন্ধে ব্যক্তিত্ব-জ্ঞান—তিনি কেমন জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চিন্তার ধারা, তাঁহার কবিতার প্রধান মূল্য ও সৌন্দর্য্য কোথায়, তাহাই বক্ষ্যমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার গীতি কবিতার মধ্যে চিন্তা ও ভাবের যে তরঙ্গগুলি বহিয়া গিয়াছে, সেইগুলি নির্দ্দেশ করাই আমার উদ্দেশ্য। এইগুলিই কবির চিন্তার গভীর অর্থ ও ধারা নির্দ্ধারণে আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করে। আবশ্যক মত আমরা কবির দীবান্ বা গজল-সমষ্টির বঙ্গানুবাদ দিয়া আমাদের কথা বলিতে চেষ্টা করিব। কেবল মাত্র যথেচ্ছ কতকগুলি শ্লোকোদ্ধার করিয়া আমরা প্রবন্ধটী ভারক্লিষ্ট করিয়া তুলিব না; কারণ প্রত্যেক গজল ও দ্বিপদী কবিতা যেন জ্যোৎস্নার কণা—ভাবের মমতাজ—সৌন্দর্য্যের মণি-মন্দির বলিয়া প্রত্যেক কবিতাই উদ্ধার করিতে ইচ্ছা হয়।

জীবনেতিহাসের প্রত্যেক খুটীনাটীর কথা ধরিলে আমরা দেখিতে পাই যে অন্যান্য কয়েকজন জগৎপূজ্য কবির ন্যায় হাফিজের জীবন-কাহিনীও আঁধারে বিলুপ্ত। পূর্ব্বতন তাজ্‌কারা বা কবিজীবনের ইতিহাসের মধ্যে আমরা যে ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা তাঁহার জীবন চরিতের পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং সে সমস্তও কিংবদন্তী ও প্রবাদ বচনের উপর নির্ভর করিয়া রচিত। সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে হাফিজকে বুঝিবার উপায় নাই; সুতরাং আমরা তাঁহার কবিতা হইতে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব!

হাফিজ যে নির্দ্দোষ ও অকলঙ্ক জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কবিতার মর্ম্মগ্রাহিগণ কিছুতেই অস্বীকার করিবে না। তাঁহার জীবন সুন্দর, সংযত, শান্ত, নির্ম্মল—ধর্ম্মের নামে তিনি যথেচ্ছাচারিতা আনেন নাই প্রেমের নামে কলুষতা বা পঙ্কিলতা আনিয়া কাব্য—সুন্দরীর অঙ্গে 'গাঢ় কলঙ্কের দাগ্‌ আঁকিয়া দেন নাই। দীবানে কতকগুলি কবিতা আছে তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, হাফিজ প্রাতে উঠিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন ও কোরাণ পড়িতেন। একটী গজলে তিনি বলিতেছেন, "হে হাফিজ, যতদিন তুমি তোমার কুটীরের নির্জ্জনতায় ও রজনীর অন্ধকারে তোমার মন্ত্র ও কোরাণ পাঠ করিবে, ততদিন তোমার কোনই ভয় নাই।" এমন নির্ভরতা জগতে বড়ই দুর্লভ।

৩

যুক্তি ও বিচারসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি এ কথা স্বীকার করিবেন না যে হাফিজ সিরাজিপূর্ণ পেয়ালার অন্ধভক্ত ছিলেন। সমান ভাবুকতা ও রসের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না বলিয়াই তিনি যে মদিরা ও সাকীর আচরণে রূপক-চ্ছলে অনেক উচ্চভাবদ্যোতক কথা বলিয়াছেন, তাহা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সমালোচকের নিকট সহজেই ধরা পড়ে। বস্তুতঃ এরূপ বর্ণনা-ভঙ্গী পারস্য কবিগণের মামুলী-প্রথা এবং এবং এই প্রথানুকরণে কেবলমাত্র ইহাই বুঝিতে হইবে যে কামনার রক্তবহ্নিমুখে কবি পতঙ্গের মত ছুটিয়া যান নাই—পরন্তু তিনি যে শব্দসমষ্টি লইয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্তরালে আর একটা মহনীয় ও চরণীয় জগৎ আছে। হাফিজ এবং পারস্যদেশীয় অন্যান্য সুফী বা অস্পষ্টবাদী (Mystic) কবিদের ইহাই বিশেষত্ব। ভাবুক ও রসজ্ঞ পাঠক

মাত্রই দেখিবেন যে তাঁহাদের কবিতা অধ্যাত্ম ও ভক্তিমূলক; কিন্তু তাহাদের ভাব রাজি এমন পরিচ্ছদে সজ্জিত যে তাহা কেমল ইন্দ্রিয়ভোগেরই পরিচায়ক। হাফিজের ভিতর এমন একজন মানবের পরিচয় পাই, যিনি প্রেমে গরীয়ান্ ও পবিত্রতায় মহান্। ধর্ম্মের যথার্থভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি চরিত্রনীতিজ্ঞ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল রকম ভানের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। বাক্য ও কার্য্যের মধ্যে ব্যবধান তাঁহার অসহ্য ছিল; ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা তাঁহাকে পীড়িত করিত; প্রেমের মধ্যে 'খাদ্' মিশানো তিনি দেখিতে পারিতেন না।

আমরা এই কথা বলিতেছি না যে হাফিজ সন্ন্যাসী ছিলেন, বা তাঁহার "কীণাঙ্ক-কঠিন" জীবনে হৃদয়ের সূক্ষ্ম ও সহজ প্রবৃত্তিগুলি কখনও জাগে নাই। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। তিনি যদি যথার্থই সংসারত্যাগী বৈরাগী হইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে প্রেমের এই মনোমোহন সঙ্গীত শুনিতে পাইতাম না। কিন্তু তিনি কখনও 'জাগতিক' :প্রেমে মজিয়াছিলেন কিনা—তাহা আমাদের অজ্ঞাত; তবে কয়েকজন সুধী সমালোচক তাঁহার কবিতার মধ্যে কবির "মানসীর" সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। আমরা জানি দান্তের বিয়াট্রিচে ছিল, পেত্রার্কের ল্যরা দে নাভিস্ (Laura de Novrs) নাম্নী একজন কুহকিনী ছিল, তাসোর (Tasso) লিওনারা (Leonara) ছিল, সেক্‌স্‌পীয়রের "W. H" নামে একজন প্রচ্ছন্ন নামা দেবতা ছিল, চণ্ডীদাসের রজকিনী রামী ছিল, বিদ্যাপতির লছমী দেবী ছিল, জয়দেব "পদ্মাবতী চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী" ছিলেন, বিখ্যাত পর্ত্তুগিজ সনেট্-লেখক কামোয়েনস্ (Comoens) এর কাথারিন্ ডা'টেড্ (Catherine d'Ataid) নামে একজন মোহিনী ছিল, স্কট্ল্যাণ্ডের কবি প্রথম জেমস্'র লেডি জেন ব্যফোর্ট (Lady Jane Beaufort) ছিল ইত্যাদি। প্রণয়িণীর উচ্ছ্বাসে সূর্য্যোদয়ে রজতগিরি হিমালয়ের উপর বহুরশ্মিরেখার ন্যায় তাঁহাদের কাব্য মহিমা ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত। এমন কি কাহারও বা প্রণয়িণীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যস্ফূর্ত্তি সমাধি লাভ করিত। বিদ্যাপতির সম্বন্ধেই প্রবাদ আছে যে লছমী দেবী সভাপার্শ্বস্থ মর্ম্মর বাতায়ন হইতে তিরোহিত হইলেই কবির কাব্য—প্রতিভা স্তিমিত হইয়া যাইত। হাফিজ দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—"আমার কথায় যে মধুরতা ফুটিয়া উঠে, তাহা সহিষ্ণুতার ফল, আমি ইহার দ্বারাই সাকী নাবাৎকে লাভ করিতে পারিয়াছি।" আর একটি কবিতার প্রারম্ভে তিনি বলিতেছেন :—

ফর্রুখের বদন-বিভায়
প্রাণ মোর জলে কামনায়—
ফর্রুখের স্রস্ত কেশপ্রায়
প্রাণ মোর পড়েছে ধাঁধায় !

কেহ কেহ অনুমান করেন এই ফর্রুখই তাঁহার স্বপ্নসুন্দরী মানসী; আবার অনেকে বলেন সুফী কবির দ্ব্যর্থব্যঞ্জক 'ফর্রুখ' শব্দটি মহম্মদকেই উল্লেখ করিয়া লিখিত হইয়াছে!

হাফিজ মানবীয় প্রেমে মজিয়াছিলেন কিনা, সে প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার হৃদয় প্রেমের মোহনবর্ণে গভীরভাবে রঞ্জিত; এখানে প্রেম অর্থে আমরা পারমার্থিক প্রেমের কথা বলিতেছি—যাহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বদেশিক, যাহা অন্তঃকরণের মধ্যে মিলনের নেশা জাগাইয়া দেয়। তাঁহার কবিতা ধারাধৌত যূথীর ন্যায় নির্ম্মল, পবিত্র ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার কবিতা আমাদিগকে রোমাঞ্চ ও মুগ্ধ করিয়া দেয় বলিয়াই আমরা বলিতেছি যে, তাহা কখনও হৃদয়হীনের প্রলাপ নহে। আমরা কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে কবির কল্পনা-বিহঙ্গী কত উচ্চে কোন্ আনন্দলোকে আপনার মানস-নীড় রচনা করিয়াছিল :—

'মহাকালের প্রারম্ভে তোমার সৌন্দর্য্য-কণা ফুটিয়াছিল—তখনই ভালবাসা আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড আলোকোজ্জ্বল করিয়াছিল।'

'......তোমার ভালবাসা মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনঃপ্রাণ বিকশিত করিয়াছে—এই ভালবাসা কেবল জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সহিত অবসানলাভ করিবে।

এইখানে আমাদের একটু মন্তব্য আছে। বাঞ্ছিতের জন্য কবির যে আকুলতা ও অতৃপ্তি;—তাহা কি এক জীবনেই শেষ হয়? কবি ইসলাম ধর্ম্মী, হিন্দুত্বের আদর্শে ও প্রতিবেশ প্রভাবে তাঁহার চরিত্র গঠিত না হইলেও পরপারের পাথেয়-স্বল্পতা তাঁহাকে কখনও বিচলিত করে নাই। তিনি ইহলোকেই তাঁহার ভালবাসার পর্য্যবসান করিয়াছেন। তাই ভক্তিরসাশ্রিত কবিতা ব্যতীত তাঁহাকে কখন কখন জড় বাসনারও উপাসনা করিতে দেখিতে পাই :—

'ওগো সাকি, এমন মদিরা দাও যাহার প্রভাব চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, কারণ স্বর্গে ত রুক্নাবাদের নদীকূল নাই, মুশাল্লার বনভূমিও নাই! ('মুশাল্লা' অর্থে মন্দির-স্থান, বা বন্ধুজনের বসন্তকালীন মিলন-ক্ষেত্র; রুক্নাবাদ—স্থানীয়

নদী)। নদী, কানন প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে কবি কত আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহা এই কবিতায় সুন্দরভাবে পরিকীর্ত্তিত; পার্থিব বস্তু যে অশাশ্বত—তাহার জন্যও একটা করুণ দীর্ঘশ্বাস পূর্ব্বোক্ত কবিতাটীতে প্রচ্ছন্নভাবে লীন হইয়া আছে। আমাদের মনে হয়, যেন দুই এক জন বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত কবি একটী নদীকূলে বসিয়া পাদচুম্বী তরঙ্গলীলা দেখিতেছেন, সেই চিত্রের পশ্চাদ্ভাগে পুষ্পিত বনভূমি, আর উপরে অনন্তশূন্যে অস্তমান্ সূর্য্যের শোণিমরাগ সঙ্গে সঙ্গে টেনিসনের সেই মধুর ভণিতাটী মনে পড়ে।

"For men may come, and men may go,
But I go on for ever"—
কত লোক আসে, কত লোক যায়,—
আমি কিন্তু বহি চিরতরে।

হাফিজ যে সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার অভাব অভিযোগ খুব অল্প ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তথাপি কাব্যের নীরব সাধনা করিবার জন্য যে টুকু শান্তি ও সাংসারিক সুখ থাকা প্রয়োজন, তাহা নিশ্চয়ই তিনি ধনী পৃষ্ঠপোষকগণের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। কারণ, তৎকালে লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ ভারতীয় পুরোহিতগণকে সাহায্যদানে উৎসাহিত করিতেন। সে কালে পারস্যে কাশিদা (eulogia) বা প্রশস্তি-কবিতা লিখিবার রীতি ছিল। হাফিজও পারস্যরাজ মনসুরকে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন;—"তোমার অধীনে কার্য্য করিয়া আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, এবং (তোমার নামের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া) আমি অমরত্বলাভ করিয়াছি।" অন্য কয়েকটী গজলে হাজি কাওয়াম্, দ্বিতীয় আশ্—আফ্, খাওয়াজা খিবামুদ্দীন প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। তিনি কেবল মাত্র তাঁহার নিজদেশস্থ ব্যক্তিগণের নিকট সাহায্য পান নাই। সুদূর ভারতবর্ষে তাঁহার যশোরশ্মি বিকীরিত হইয়াছিল। তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের মুসলমান রাজার দ্বারা পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও তথায় আগমন করেন নাই। উত্তর স্বরূপ তিনি একটী গজল লিখিয়া পাঠাইলেন; তাহা এই;—'জীবনের ভীতিপূর্ণ রাজ-মুকুট লোভজনক শিরোভূষণ বটে, কিন্তু শিরঃপীড়া ঘটায় বলিয়া আমি ইহা চাহিনা।'

তাঁহার কবিতার সমসাময়িক সমালোচনার প্রতি ও তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। আমরা কখনো বা তাঁহাকে আত্মপ্রশংসাবাদে আনন্দিত হইতে দেখি।

আত্ম গুণ কীর্ত্তন পারস্য কবিগণের চিরন্তন প্রথা। কিন্তু হাফিজ গতানুগতিকের ন্যায় সে প্রথার অনুসরণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার কবিতা মুক্তার মালার মত।—পাঠকগণ তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিলে গগন মণ্ডল তাঁহার কবিতার উপর তারকা-কুসুম বর্ষণ করিবে। কার্য্যগৌরব ইহা অপেক্ষা উন্নত হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কেবল ভবভূতির সেই গৈরিক-নির্ঝর-পূর্ণ শ্লোকটী মনে পড়ে—"উৎপৎস্যতেহস্তি মম কোহপি সমানধর্ম্মা" ইত্যাদি। সঙ্কীর্ণচিত্ত সমালোচকদের প্রতিও তিনি একটু তীব্র ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'হাফিজের কবিতার যে দোষানুসন্ধান করে, বলিব-তাহার মোটেই রসবৈচিত্র্য অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই।'

[ক্রমশঃ]

প্রেমের পাল্লা

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

ভারি চোট্‌পাট্‌—খুব কড়াকড়া বুলি
—না হয় আজকে দিয়েছ দু'গাছা রুলী ?
চুল ওঠে তাই দিয়েছ যে তেল কিনে
তা'তেত তোমারো গরজ কম দেখিনে !
কপালের টিপ ?—দু'খানা আলতা পাতা ?
ছাতা দিয়ে তাই কিনে ফেলেছেন মাথা !
হলুদ রঙের সুতো এক ফেটি কই ?
এদিকে বলেন,—"তুমি ছাড়া কারো নই !"
নাকছাবী টাত ডবডবে বেমানান
ভালবাস কত তাই বুঝি এ জানান ?
ফুল দিতে ভুল একমাস যার হয়
সে কেন দেখায় 'বেবাগী' হ'বার ভয় ?

মিছে কথা শুনো কেমনে যে মুখে ফোটে
এখনও যে পূবে চন্দ্র সূর্য্য ওঠে
আমার জন্য খেটে খেটে তুমি সারা ?

আগে ভেবে দেখ কথাটা কেমন ধারা !
নাক ডেকে ঘুম ? কখন শুন্‌লে বল ?
দিনে ঘুম ?—আমি ? মার কাছে বসে বসে
রামায়ণ পড়ি খরচ দিই যে কসে'—
তোপ ভোরে উঠি, তখনি রাঁধার তাড়া
বাবুর—ঘুমত ভাঙ্গে না চায়ের পেয়ালা ছাড়া !
ঘর ঝাট দেওয়া একগাদা পান সাজা
ওঠা নামা করে পড়ে গেল মোর মাজা,
এর মাঝে কর টেবিল বাজিয়ে গান
সত্যি বল্‌ছি,—আন্‌চান্‌ করে প্রাণ !

সাবানের কথা ? বলোনাক' মুখ নেড়ে
আতরের শিশি ? কালত নিয়েছ কেড়ে !
সাবান মাখিলে তাতে দেবে রোজ গালি
বাক্স এদিকে তোমার হাতেই খালি।
গন্ধ মাখিনে সন্ধ করেছ মনে
কত কথা তুমি বলেছ দিদির সনে।
"হেনা"র শিশিটা উপহার দিলে সই
"লক্ষীটি মেখো" বলে দিলে পই পই
বেছে বেছে কেনা অমন সাধের "জুঁই"
তোমারে লুকায়ে বল দেখি কোথা থুই ?
ভাল যে বেসেছ সেটাকি এমন বেশী

কথা না কহিলে কেঁদেছ সত্যি বটে
কার দোষ ? বলি—বুদ্ধি নেই কি ঘটে ?
উপরে 'কলে' জল ওঠেনিক কাল
সংসার করা জাননাত নাজেহাল !
ঘুম পেয়েছিল কইতে পারনি কথা
অমনি বাজিল পরাণে দারুণ ব্যথা ?

রেগে শুলে ভুঁয়ে বিছানাটা ছেড়ে দিয়ে
অতএব-ফোঁস—কেন করেছিলে বিয়ে ?
কাছ ছাড়া হলে সয়না সেটাত জানি ?
তা বলে কেমনে পাল্লায় বড় মানি ?

'চিঠি চিঠি' বলে গর্ব্ব করো না আর
সে গুমোর ওগো হয়ে গেছে সব বা'র
তিন খানি চিঠি দিই ছিলে রেখে ঢেকে
দাসী-দিয়েছিল—পাঁ—চ খানা একে একে !
যা দিয়েছ তার দিগুণ নিয়েছ ফিরে
মিথ্যা বলোনা রইল মাথার কিরে।

পতিতার সিদ্ধি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ]

(২৬)

স্ত্রীর দৃঢ়তার কাছে হার মানিয়া চারুর 'বাবু' ব্রজেন্দ্রনাথ যে সময়ে অবসাদে শয্যায় শুইয়া পড়িল, তখন রাত্রি এগারোটা। সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে সেই নূতন প্রবিষ্ট চারুর বাড়ীতে তাহাকে একা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত মনুষ্য-হীনতার কার্য্য হয় মনে করিয়া সন্ধ্যার পর হইতেই ব্রজেন্দ্র সেখানে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী নির্ম্মলা কিছুতেই তাহাকে আজ বাড়ীর বাহির হইতে দেয় নাই। সে জন্য নির্ম্মলাকে আজ একটু বিশেষ উগ্র মূর্ত্তিই ধরিতে হইয়াছিল। নয় বছরের বালক নালু যদিও ক্রুদ্ধা মায়ের মূর্ত্তির সম্মুখে বিপন্ন পিতাকে, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কিন্তু পাঁচ বৎসরের পুঁটি চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই!

ব্রজেন্দ্র যাইবার জন্য মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়াছিল বলিয়াছিল না গেলে চারু একা থাকিবে খুব সম্ভব বিপদে পড়িবে।

নির্ম্মলা বলিয়াছিল সেটা স্বামীর গাড়োলত্ব, সে বেশ্যাকে একা থাকিতে হইবে না, গাড়োলের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া যাহারা খায়, তাদের মধ্যে একজন সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে সারারাত্রি আগুলিয়া থাকিবে।

রাত্রি প্রায়—এগারোটার সময় চাকর হেমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া এবং তাহাকে সারারাত্রি সেখানে থাকিবার আদেশ দিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বাস্তবিক অবসন্নেরই মত শয়ন করিল!

ঝোঁকের সময়টা উত্তীর্ণ হইতেই সে বুঝিয়াছিল, নির্ম্মলা তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির হইতে না দিয়া যথার্থ স্ত্রীর যোগ্যই কাজ করিয়াছে। সে বিষম ঝড়ে অন্ধকারে বাহির হইলে বিপদের যথেষ্টই সম্ভাবনা ছিল।

নির্ম্মলা সবই ভাল করিয়াছে, কেবল একটি কথা কহিয়া সে চারুর প্রতি বিশেষ নিষ্ঠুরের ভাবই প্রকাশ করিয়াছে। সে বলিয়াছে, চারু ব্রজেন্দ্রের বিরহে সারারাত্রি তার বিছানায় পড়িয়া কণ্ঠায় কণ্ঠায় ঝড় খাইয়া ছটফট করিবে না, আর একটি খেঁকশিয়ালী জাতীয় ধূর্ত্ত এই ঝড়ের সুযো গ গাড়োল ব্রজেন্দ্রের স্থান অধিকার করিবে। বরং আফিস হইতে ঘরে না আসিয়া প্রারম্ভেই যদি সে চারুর কাছে যাইত, তাহা হইলে যতক্ষণ নির্ম্মলা স্বামীর সংবাদ না পাইত, ততক্ষণ সে উঠিয়া বসিয়া চলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পাইত না।

শয্যায় পড়িয়া যে সময় ব্রজেন্দ্র নির্ম্মলার কঠোর বাক্যের প্রতিবাদ স্বরূপ চারুর নির্ম্মলত্ব-ধ্যানে একটু তন্ময় হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে নির্ম্মলা ঘরে ঢুকিয়া বুঝি তাহাকে একবার ডাকিয়াছিল ব্রজেন্দ্র সেটা শুনিতে পায় নাই।

স্বামী ঘুমাইয়াছে মনে করিয়া সে একবার শয্যার পার্শ্বে আসিল। কাছে গিয়াই তার বুঝি একটু জোরের নিশ্বাস সে শুনিতে পাইল। শুনিয়াই বলিল —"দীর্ঘ নিঃশ্বাস—কেন গো? এখনও ত যাবার সময় উত্তীর্ণ হয় নি।"

"না নির্ম্মলা, আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম। এখন বুঝেছি, তুমি আমাকে ধরে রেখে ভালই করেছো। তবে তাকে এতটা হীন মনে করা তোমার অন্যায় হয়েছে।"

"বেশ ত গো মহৎ সে। তার মাহাত্ম্য না জেনে একটা কথা কয়েছি, তাতে অতবড় দীর্ঘশ্বাস কেন? হেমাকে ত আগ্‌লাবার ভার দিয়েছ—"

"তাতে বেশী অন্যায় হয়ে গেছে নির্ম্মলা। বরঞ্চ তাকে না পাঠানোই ছিল ভাল। আমি যে যেতে পারলুম না তাতে তত দোষ হয় নি। সে

নিশ্চয়ই বুঝতো আমি চেষ্টা করেও বাড়ী থেকে বেরুতে পারি নি; কিন্তু হেমাকে পাঠাতে সে মনে করতে পারে যে আমি তাকে বিশ্বাস করি না।"

"তবে তাকে পাঠালে কেন? হেমাকে পাঠাতে আমি ত বলিনি।"

এ কথায় ব্রজেন্দ্রের উত্তর দিবার কিছুই ছিল না। নির্ম্মলা ত তাহাকে যাইতে বলে নাই। শুধু তাই কেন, তার চিঠিখানা ত সে নির্ম্মলাকে একেবারেই গোপন করিয়া পাঠাইয়াছে। তবু সে বলিল—"তুমি যে রকম করতে লাগলে!"

"আমি কি করলুম? ও বুঝেছি—তা আমার কথা শুনেই সে সতীরাণীর মহত্ত্বে তোমার সন্দেহ হয়ে গেল?"

"সন্দেহ হবে কেন!"

"দেখ, লেখাপড়া শিখেও যে মানুষের এত অধঃপতন হ'তে পারে তা জানতুম না। আমার মনে যা এলো, মুখেও তাই বলেছি, কিন্তু তুমি এমনি পুরুষ, মনের কথা মুখে আনতে ত সাহস করলে না, কাজে দেখালে। আবার এখন তার জন্য আমাকে দোষী করছ। আমার কথায় হেমাকে পাঠাওনি ঠাকুর, সতীরাণীকে এতটুকু বিশ্বাস কর না বলেই পাঠিয়েছ!"

"আমাকে বিশ্রাম করতে দাও।"

"বেশ, আমার কথাতেই যদি হেমাকে পাঠিয়ে থাক, তা হ'লে বল, আমি একখানা ক্ষমাপত্র লিখে সে মাগীর কাছে পাঠিয়ে দিই।"

"কি আপদ, তুমি যে বাহিরের ঝড় ঘরে ঢোকালে দেখছি।"

"তবে আর কি, দুর্গা বলে বাইরের ঝড়ে ঝাঁপ খেয়ে পড়।" বলিয়া নির্ম্মলা চারুকে উপলক্ষ করিয়া আরও গোটাকতক তীব্র রহস্য স্বামীকে শুনাইয়া দিল। সেই সঙ্গে সে চারু যে ব্রজেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে অনাথিনী থাকিবে না, একথা দ্বিতীয়বার শুনাইতে কুণ্ঠিত হইল না।

কলহশেষে তার কথার সত্যতার নির্দ্ধারণে হেমার ফিরিবার প্রতীক্ষায় যখন নির্ম্মলা তার রোরুদ্যমানা কন্যাকে শান্ত করিতে নিজের শয্যায় চলিয়া গেল, তখন ব্রজেন্দ্র কতকগুলা ভাবনার আক্রমণের দিঙ্‌নির্ণয় করিতে একান্ত অশক্ত হইয়া নিরুপায়ে—ঘুমাইয়া পড়িল।

(২৬)

স্বামীর প্রতি কঠোর বাক্য আজ যেমন সে প্রয়োগ করিয়াছে, এরূপটি নির্ম্মলা এর পূর্ব্বে আর কখনও করে নাই। করিবার যত প্রকার কারণ

থাকিবার থাকিলেও সে করে নাই। স্বামীর প্রতি কঠোর হইবার জন্য দুচার জন সমবেদনাময়ী মহিলা এমন কি তার সৎশ্বাশুড়ী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াও সে বরাবর মিষ্ট ব্যবহারেই স্বামীর কার্য্য উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। স্বামীর এই বেশ্যাসক্তির জন্য অন্তর তার সর্ব্বদা অসুখী থাকিত বলিয়া মুখে যে সে স্বামীর কাছে ভিখারিণীর মত করুণার আবেদন শুনাইবে, সে মেয়ে নির্ম্মলা আপনাকে কোনও কালে মনে করিতে পারে নাই।

তাহার উপর স্বামীর এই বিষম দোষেও সে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, দোষটা যেন তার দেখিয়াও দেখিত না।

এরূপ করিবার তার একটা বিশেষ কারণ ছিল। তাহার স্বামী এমন একটা বড় রকমের কুলীন যে, তার একটিমাত্র বিবাহ তখনকার অনেকটা পরি-বর্ত্তিত যুগেও তাহার সমাজে অত্যাচার বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কেন না ব্রজেন্দ্র অন্যদার পরিগ্রহ করিতে নিরস্ত হওয়ায় তাহার পাল্‌টি ঘরের মধ্যে দুই চারিটী কন্যার আজীবন কুমারী থাকিবার অবস্থা হইয়াছিল।

তাহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল বিক্রমপুর। ব্রজেন্দ্রের পিতা নরেশচন্দ্র গাঙ্গুলি বিবাহসূত্রে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। শ্বশুর কর্ত্তৃক প্রতিপালিত, শিক্ষিত শেষে তার সাহায্যে হাকিম হইয়াও তাঁহাকে বাধ্য হইয়া একাধিক বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তাঁর শ্বশুর এরূপ কার্য্যে তাঁহাকে নিষেধ করিতে সাহস করেন নাই।

কিন্তু ব্রজেন্দ্র আর বিবাহ করে নাই। নির্ম্মলার একাধিকার সুখ ভাঙ্গিয়া দিতে মাঝে মাঝে তাহার উপর সমাজের দিক হইতে এক একটা বেশ প্রবল রকমের আক্রমণ আসিত। তাহার শ্বশুর পর্য্যন্ত দুই একটা আক্রমণে এমন নির্দ্দয় ভাবে যোগ দিয়াছিলেন যে স্বামীর একমাত্র দৃঢ়তা ভিন্ন কিছুতেই সে সপত্নী-দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা পাইত না।

সুতরাং আগেকার নির্ম্মল-চরিত্র কিন্তু তাহার ভাগ্যদোষে পদস্খলিত স্বামীর এ দোষটাকে নির্ম্মলা ততটা দোষের মধ্যে গণ্য করিত না। তার স্বামী ও কৃতবিদ্য। শুধু তাই নয়, হাইকোর্টের এটর্ণিগিরি করিয়া এত সে অর্থ উপার্জ্জন করে যে, তাহা হইতে বহু অর্থ অপব্যয় করিয়াও যে টাকা সে নির্ম্মলার হাতে আনিয়া দেয়, তাই যদি সে রাখিতে পারে, তাহা হইলে পুত্র নালুবাবু মুর্খ হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলেও পায়ের উপর পা দিয়া আজীবন বসিয়া খাইতে পারিবে। স্বামী যদি আর দুই একটা বিবাহ করিত এবং তাহাদের প্রত্যেকের পেটে দুই

একটি করিয়া ছেলে মেয়ে হইত, তা হইলে নালুবাবুর যা ক্ষতি হইত, নির্ম্মলা বেশ বুঝিয়াছে স্বামী চারুর মত দু চারিটা রক্ষিতা রাখিলে তার এক আনা ও ক্ষতি হইবে না।

স্বামীকে তীব্র তিরস্কার করিয়া নির্ম্মলার চিত্তটা বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তবে তার দুঃখের মধ্যেও একটা বিষয় আবিষ্কার করিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। তার উপেক্ষার নীরবতা স্বামীকে অনুতপ্ত করিতে এতটা যে শাসন করিয়াছে, তাহা সে আগে বুঝিতে পারে নাই। আজ আত্মহারা ব্রজেন্দ্রকে ঝড়ে ঘর হইতে কিছুতেই বাহির হইতে দিবে না বলিয়া কোমর বাঁধিতে সেটা সে বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, স্বামী তার চরিত্রহীনতার জন্য অনুতপ্ত। তার আর চারুর গৃহে যাইবার ইচ্ছা নাই।

তবে বিনাপরাধে কেমন করিয়া স্বামী চারুকে পরিত্যাগ করিবে। চারুর রূপ গুণে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজেন্দ্র নিজেইত উপযাচক হইয়া তাহাকে ধরা দিয়াছে। তাহাকে আয়ত্ত করিতে চারুর কত অবজ্ঞাত প্রেমিকের হা হুতাশ ও অভিশাপের কণ্টকময় বেড়া যে ব্রজেন্দ্রকে ভেদ করিতে হইয়াছে। সে কথা মনে করিলে, চারুর কাছে নির্ম্মলাকেইত মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহাকে ত্যাগ করিতে স্বামীকে অনুরোধ করাত পরের কথা। বিনাপরাধে এখন চারুকে পরিত্যাগ করিলেই বা তাহার স্বামীর মনুষ্যত্ব থাকে কই? স্বামীর সহিত কলহ করিতে গিয়া নির্ম্মলা বুঝিল, সে চারুকে পরিত্যাগ করিতে এখন কেবল তার বিশ্বাসঘাতকতার অপেক্ষা করিতেছে। হেমাকে পাঠাইয়াছে ব্রজেন্দ্র চারুকে আগলাইবার জন্য নহে, আর কেহ লুকাইয়া তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করে কি না সেটা ও জানিবার জন্য। স্বামী ঘুমাইয়াছে, কিন্তু নির্ম্মলার ঘুম হইতেছে না। শয্যায় পড়িয়া হেমার মুখ হইতে একটা সুসংবাদের প্রত্যাশায় সে কেবল দেবতাকে মানত করিতেছে। হেমা ফিরিয়া যেই স্বামীকে বলিবে চারুর ঘরে মানুষ প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে, অমনি সে হেমাকে ভাল রকম বক্‌সিস্ দিবেই, দেবতার জন্য ও ষোড়শোপচারের পূজার খরচ তখনি মাথায় ঠেকাইয়া সে বাহিরের ঝড়ের অবসানে ভিতরকার চিরাবরুদ্ধ ঝড়টাকেও গঙ্গাজলে ডুবাইয়া দেবতার চোখের ও অন্তরাল করিবে।

(১৭)

দুপুর বাজিবার পর সে শুইয়াছে। একটা, দুইটা ঘড়ী তাহার ঘণ্টা দিয়া নির্ম্মলার অনিদ্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়া গেল। দুইটা হইতে তিনটার মধ্যে

এক সময় জাগিয়া থাকিবার বিশেষ চেষ্টাতেও সে একটু ঘুমাইয়া পড়িল। ঘড়ীতে তিনটা বাজিতে তার শেষ শব্দটা পূর্ব্বের শব্দ ছুটার মত যেমনি নির্ম্মলার কাণের পাশ দিয়া নিঃশব্দে পলাইবার চেষ্টা করিল অমনি সে এক চমকেই বিছানার ওপর বসিয়া দেখিল, ঘরের আলোটা নিভিয়া গিয়াছে।

তার চারিদিকে দৃঢ় আবদ্ধ ঘরের জানালাসার্শির ফাঁকদিয়া ঢুকিয়া বাহিরের ক্ষীণ আর্ত্তনাদকারী ঝঞ্ঝাতরঙ্গ সেফ্‌টিল্যাম্পের আলোক শিখাটাকে যে খাইয়া ফেলিতে পারে এটা নির্ম্মলার মনে হইল না। সে বিছানা হইতে উঠিল, সংশয়ত্রস্ত-পদে স্বামীর পালঙ্কের কাছে উপস্থিত হইল, প্রথমে পাশে দাঁড়াইয়া নিদ্রিতের স্বভাবগভীর শ্বাসশব্দ শুনিতে একটুক্ষণ কান পাতিয়া রহিল, কোনও শব্দ শুনিতে না পাওয়া ঝড়ের দুষ্টামির জন্যও হইতে পারে মনে করিয়া হাত দিয়া বিছানাটা পরীক্ষা করিতে বুঝিল সেখানে স্বামী নাই।

তখন দুই হাত দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া দোরের কাছে উপস্থিত হইতেই সে জানিতে পারিল, বাহির হইতে দ্বারবন্ধ করিয়া স্বামী চলিয়া গিয়াছে। তার যাওয়াটা বেশীক্ষণ না হইলেও নির্ম্মল এটা বেশ বুঝিল, চারুর বাড়ীতে যাইবার সমস্ত বিঘ্ন সে যেন সিন্দুকে পূরিয়া তালা বন্ধ করিয়াছে। ঘরের দুই দিকেই দোর, দুই দিকই প্রশস্ত বারান্দা ছিল। নির্ম্মলার স্বামীর নির্ম্মমতার সুনিশ্চিত একটা পরিমাণ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিল না। এইবারে আবার নিজের শয্যার কাছে আসিল। বিছানার তলা হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া জ্বালিয়া দেখিল, কই স্বামী ত লণ্ঠনটা লইয়া যায় নাই। তখন সেটা জ্বালিয়া সে অন্যদিকের দোর খুলিল। খুলিতেই ঝড়ের তখনও পর্য্যন্ত প্রবলের অনুভূতির সঙ্গে স্বামীর মোহজবিচেষ্টা কল্পনার সমস্ত তীব্রতা দিয়া সত্যের মতন করিয়া সে গাঁথিয়া ফেলিল। বুঝিল, তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য স্বামী তাকে শেষকালে কেবল কতকগুলা স্তোকবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছে।

এখন সে কি করিবে? অবজ্ঞাতার নৈরাশ্যের ভিতর নিশ্চিহ্ন নিমজ্জিত, পূর্ব্ব হইতেই তার অবসন্ন চিত্ত লইয়া কিই বা এখন সে করিতে পারে? স্বামী অনেকক্ষণ ঘর ত্যাগ না করিলেও, বাড়ী ছাড়িয়া পথে পড়িবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট। আলোটা নিবিয়া যাইবার কারণ ও সে কল্পনার সাহায্যে নির্ণয় করিল। আলো থাকিলে পাছে তার চমকা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া দ্বার খুলিয়া স্বামীর যাইবার মুখে আবার সে তাকে ধরিয়া বসে, তাই তার তন্দ্রার উপরে ঘুমের প্রগাঢ়তা

ঢালিবার জন্য, অথবা ঘুম ভাঙ্গিলেও তাহার অনুসরণ পথটা দীর্ঘ করিবার জন্য স্বামী আলো নিবাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সে আবার দোর আঁটিয়া শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু শয়ন করিতে গিয়া আবার উঠিয়া বসিল। অভিমান ঈর্ষ্যার মধ্য দিয়া পত্নীর যে পতি অনুরক্তি অতি গোপনে মনকে লুকাইয়া হৃদয় পথ দিয়া চলাচল করে, তার একটা অঙ্গুলি পীড়ন নির্ম্মলার শয়ন চেষ্টাকে কাতর করিয়া দিল।

"বৌদি!"

তার সৎশ্বাশুড়ীর ঘর দিয়া স্বামীর তত্ত্ব লইবার সঙ্কল্পে যেমন সে আবার দোর খুলিবার জন্য খিলটিতে হাত দিয়াছে, অমনি নির্ম্মলা বাহির হইতে দোরের আঘাতের সঙ্গে শুভার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। শুভা তার সৎশ্বাশুড়ীর একমাত্র কন্যা।

নির্ম্মলা দোর খুলিল।

"তুমি কি দোর ধরে দাঁড়িয়ে ছিলে বৌদি?"

"ডাকছিস্ কেন?"

"শিগ্‌গির এসো।"

"কোথায়?"

"দাদাকে ধরতে।"

যেটা সে আপনি আপনি করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া সে কাজে নির্ম্মলার প্রবৃত্তি আবার আপনি দমিত হইয়া গেল।

"কেন?"

"কেন, পরে বলব বৌদি, আগে তুমি তাঁকে ফিরিয়ে আনো।

"দরকার কি? আর তোর এ কি রকম আক্কেল শুভা, আইবুড়ো ধেড়ে মেয়ে ভাইকে আগলাতে এতরাত্রি পর্য্যন্ত জেগে রয়েছিস্!"

"তোমার জন্য বৌদি!"

"আমার জন্য তোর অত মমতার বাড়াবাড়ি করতে হবে না, তোর দাদা কোথায়?"

"এখনও বাড়ী আছেন—কোচোয়ানকে গাড়ী জুততে বলেছেন।"

"তুই কি সদর দোর পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়েছিলি নাকি!" শুভার উত্তর পাওয়ার মুহূর্ত্তের বিলম্ব ও অসহনীয় বোধে নির্ম্মলা আবার বলিল, "ছি শুভা, কেউ যদি বাইরের লোক কোথা থেকে অন্ধকারে তোকে একা ঘুরতে দেখতো—"

"মা আমার সঙ্গে আছে।"

"বৌমা!" বলিয়াই শুভার মা নির্ম্মলার কাছে আসিয়া, শুভারই মত, তার স্বামীকে ধরিয়া আনিতে অনুরোধ করিল।

"ধরে লাভ কি মা?"

"লাভালাভ বোঝবার সময় নেই বৌমা, ব্রজেন্দ্র রিভালবার নিয়ে যাচ্ছে।" এই এক কথাতেই সমস্ত বুঝিয়া নির্ম্মলা আর কালবিলম্ব না করিয়া স্বামীকে নিরস্ত করিতে ছুটিয়া গেল।

শুভা ও সঙ্গে সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, মায়ের নিষেধে যাইতে পারিল না। এই সময় পুঁটিটা কাঁদিয়া উঠিতে তাহার যাইবারও উপায় রহিল না।

(২৮)

চাকর বিশু জাতিতে কাহার, বহুদিন হইতে চারুর গৃহে চাকরী করিতেছে। তাহাতে মাহিনা ছাড়া আরও পাঁচরকম উপরি রোজগারে কয়েক বৎসর হইতে এমন লুব্ধ হহয়াছে যে, এখন যদি কেহ জুতা মারিয়াও তাহাকে চারুর ঘর হইতে বাহির করিতে যায়, তাহা হইলেও সে তার মনিবনীর চৌকাট ধরিরা উপুড় হইয়া সেগুলা নিঃশব্দে পৃষ্ঠস্থ করিবে, তবু চৌকাট হইতে হাত ছাড়িবে না। সে চারুর বাবুকে কেবল চারুর জন্যই বুঝে, সুতরাং এই নিমকভোজীর আথ্যাধারী নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধির চাকর যখন তার মনিবনীর কাছে শুনিল যে বাবু আসিলেও তাহাকে না জানাইয়া যেন সে দোর খুলিয়া না দেয়, তখন বাবুর চাকর হেমা যে আসিবা মাত্রই বিশুর কাছে দরজা খোলা পাইবে, এটা আমাদের বুঝিতে যাওয়া মস্ত ভুল।

হেমা যখন ঘরের উৎপাতে অস্থির হইয়া বারংবার দোরে ঘা দিয়া শীঘ্র তাহা খুলিয়া দিতে বিশুকে হুকুমের উপর হুকুম করিল, বিশু তখন তাহাকে বাহিরেই অপেক্ষা করিতে বলিয়া তার 'মাঈ'কে খবর দিতে উপরে চলিয়া গেল। সুতরাং বাহিরে দাঁড়াইয়া হেমা যে শুধু 'বিশে'র উপর মর্ম্মান্তিক চটিল এমন নয়, বাবুর বিবির ঘরে যে দোসরা মানুষ প্রবেশ করিয়াছে এ বিষয়েও তার আর কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকায় তাহারও উপরে সে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইল। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিতে লাগিল সারারাত জলে ভিজিয়া, শীতে জমিয়া যদি সেইখানে আজ তাহাকে মরিতে হয় তবু সেই উপচোরটাকে না ধরিয়া কিছুতেই সে দোর ছাড়িয়া যাইবে না।

ঝড় যেমন তাকে মাঝে মাঝে এক একটা সরস রহস্যের ধাক্কা দিতে লাগিল, তার সঙ্কল্পটাও সেই অনুপাতে দমে ভারী হইতে লাগিল।

কিন্তু বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের অধিকার পাইয়া চারুকে মনিবের পত্র দেখাইতে যখন সে তৎকর্তৃক নীত হইয়া সে রাত্রির সেই নবাগত রক্ষকটিকে দেখিল, তখন সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। এযে তার মনিবেরই বাড়ীতে পূজারির কার্য্য করে। ঈর্ষায় ক্রোধে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু চারু স্বযুপ্ত রাখুকে এত সন্তর্পণে একটিবারের মত দেখাইয়া, আবার তাহাকে এমন যত্নে অন্ধকারে ঢাকিয়া হেমার চোখের অন্তরাল করিয়া দিল যে, একান্ত নীরব হওয়া ভিন্ন একটা দীর্ঘশ্বাসেও তখন তার ক্রোধ প্রকাশের উপায় রহিল না।

দেখাইয়া চারু সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া হেমাকে নিজের ঘরে লইয়া গেল, সেখানে তার দত্ত চিঠিখানা পড়িয়া প্রত্যুত্তরে একখানা চিঠি লিখিয়া হাতে দিয়া বাবুকে দিবার জন্য তাহাকে বাড়ী ফিরিতে আদেশ করিল। হেমা সেখানে রাত্রিকালে থাকিবার কথায় বাবুর আদেশ জানাইলে বলিল থাকিবার তার কোনও প্রয়োজন নাই, যে হেতু তাকে রক্ষা করিতে ভগবান্ রক্ষক পাঠাইয়াছেন।

রাখুর সেখানে উপস্থিতির কৈফিয়ৎ চারু পরিস্কাররূপে দিলেও চাকরটা তাকে বিশ্বাস করিতে পারিত না, সুতরাং তাহার এ অর্থশূন্য ভগবানের দয়ার কথা সে একেবারেই বিশ্বাস করিল না। এটাতে বিশেষতঃ চারুর মমতাশূন্য ব্যবহারে তার দুরভিসন্ধিটাই সে নিশ্চিত ধারণা করিয়া লইল।

রাখুর নিদ্রা ও কপট বলিয়া তার বোধ হইল। সেই দুর্য্যোগে বাড়ীতে ফিরা নিতান্ত সহজ না হইলেও, সে মনিবকে এই নিমকহারামীর কথা শুনাইবার জন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছে যে, আকাশ তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেও সেই মুহূর্ত্তেই চারুর ঘর তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। বিশেষতঃ সেই ট্যানাপরা ঠাকুর—পূজা-করা ভিৎভিতে বামুনটার অদ্ভুত সাহস তার ভিতরে ঈর্ষ্যার আগুনটা এমন জাগাইয়া তুলিল যে, বায়ুর সজল ফুৎকারও তাহা নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, কেবল তার হাত পা মুখ চোখ—এমন কি সকল অঙ্গে কতকগুলা ক্রোধের সঞ্চালন যোগ করিল মাত্র।

তবে—নীচে আসিয়া দেখিল বিষেটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে এ সুযোগটা ছাড়া কোনও ক্রমে যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। বিশের ঘুমটার সঙ্গে তার দুই

একবার পরিচয় হইয়াছিল। বিশু নিজে নিমকহারাম না হইলেও, তার ঘুমটা মাঝে মাঝে নিমকহারামি করিত। যে রাত্রিতে তার কিছু উপরি পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিত, সে দিন ঘুমটা তার বহিঃসংজ্ঞাকে এত জোরে চাপিয়া ধরিত যে ঢাকের বাদ্য তার কাণের কাছে তাণ্ডবনৃত্য করিলেও সে বিশুর কাণকে তার অস্তিত্ব জানিতে দিত না।

হেমচন্দ্র এ সুযোগটা ছাড়িতে পারিল না। সে মনে করিল, মনিবকে যদি এই নিমকহারামির কথা শুনাইতেই হয়, তবে এ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়াই তাহাকে শুনাইয়া দিইনা কেন! সে তখন সদরে যাইবার পথের পার্শ্বে, যেখানে পূর্ব্বে চারু রাখুকে বসাইয়াছিল, সেই ধাপের উপর অন্ধকারে গা ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

রাখু সিঁড়ির মাথায় চলিষ্ণু অন্ধকাররূপে এই হেমাকেই দেখিতে পাইয়াছিল। হেমচন্দ্র লুকাইয়া লুকাইয়া চারু ও রাখুর সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছে। দেখিয়া উত্তরোত্তর বুকের ভিতর এত ঈর্ষার উত্তাপ সে সঞ্চয় করিয়াছে যে, যখন রাখুকে ঘরের মধ্যে পূরিয়া চারু সন্তর্পণে কপাট বন্ধ করিল, তখন সে দৃশ্য একান্ত অসহ্য জ্বালায় উন্মত্তের মত করিয়া চারুর বাড়ী হইতে সেই বিষম দুর্যোগের ঘনতমসাচ্ছন্ন রাজ পথে তাহাকে গলা টিপিয়া বাহির করিয়া দিল।

যাহা দেখিয়াছে তাহার সঙ্গে যাহা না দেখিয়াছে কল্পনায় যোগ দিয়া হেমা তাঁহার মনিবকে চারু ও রাখুর রাত্রিবিলাসকাহিনী এমন করিয়া শুনাইল যে, ব্রজেন্দ্রের শিক্ষাসংযতচিত্ত ও প্রতিহিংসার উত্তেজনায় উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল। চারু রাখু উভয়কেই একসঙ্গে হত্যা করিবার জন্য ঈর্ষা-মত্ত ব্রজেন্দ্র যখন নিজের পরিণাম ভাবিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া রিভলবার খুঁজিয়া দিতে হেমাকে জেদের উপর জেদ, শেষে তীব্র ভাষায় গালি দিতেছিল, আর চতুর হেমা সেটাকে আগেই লুকাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার অছিলায় বৈঠকখানা ঘরের সব আসবাব পত্র ওলটপালট করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই শুভা দাদার অনুসরণে সেখানে উপস্থিত হইয়া অন্তরাল হইতে সমস্ত কথা গুলা শুনিতে পাইল। শুনিয়াই ভীতি বিহ্বলা সে মাকে গিয়া সে কথা শুনাইয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

প্রেম-মুগ্ধা

[শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

১

দ্বারকার রাজভোগে তৃপ্তিহীন নারায়ণ,
পড়ে মনে ক্ষণে ক্ষণে মধুমাখা বৃন্দাবন!
কোথা সখা সখীদল, নিথর তমালতল,
যমুনার 'কল' গীতি,
বাঁশীর আকুল তান,
সকলি স্বপন হেন হ'ল যেন:অবসান।

২

মহিষীগণেরে তাই কন হরি অনুক্ষণ
"গোপী-প্রেম-মাধুরীতে পূর্ণ মোর প্রাণ-মন!"
সবিস্ময়ে ভাবে সবে, 'এত সুখৈশ্বর্য্য ভবে,
রাখালরাজার তবু
কেন চিত্ত উচাটন,
কিযে আছে গোপীপ্রেমে যার এত আকর্ষণ!"

৩

কে জানিবে সে সন্ধান—শ্যামের ব্যাকুল প্রাণ—
•কোথা ক্ষুদ্র কমলিনী কোথা রবি জ্যোতিষ্মাণ!
দিনে দিনে ক্ষীণ কায়, সারা হৃদি কারে চায়,
উৎকণ্ঠিতা সত্যভামা,
রুক্মিনী উন্মত্তা প্রায়।
সন্ধ্যার আঁধার নামে দ্বারকা ও মথুরায়!

৪

শ্রীকৃষ্ণেরে নিরখিতে একদা নারদ ঋষি
আসিলেন দ্বারকায় মাতাইয়া দশদিশি!

হেরি তাঁর ম্লান মুখ শুধাইলা কিবা দুখ,
কহিলেন লীলাময়—
"গুরু ব্যাধি—প্রতিকার—
একটুকু পদধূলি!—কেবা দিবে উপহার?"

৫

গোপী-কথা বিনে তাঁর অন্য কথা নাহি আর,
শুনি দেবর্ষির মনে লাগে বড় চমৎকার!
রোগ গ্রস্ত নারায়ণ, সম্ভব কি কদাচন?
"পদধূলি প্রতিকার"
এযে আরো সমস্যার!
তারপর "গোপী-প্রেম"—সেত নহে বুঝিবার!

৬

কি জানে প্রেমের কথা অবোধ আভীরবালা,
যার লাগি নিশিদিন এমন অধীর কালা
রাণীদের এত সেবা, কখন পেয়েছে কেবা,
তবু তৃপ্তি—শান্তি হীন,
তবু নিত্য এত জ্বালা!
মণিহারে কে করিল অতর্কিতে ফণি-মালা!

৭

সংশয়-দোদুল-চিত্তে দেবর্ষি চলিলা ফিরি'
নীরব মুখর বীণা, উড়ে জটা ধীরি ধীরি।
শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা লয়ে, উত্তরিলা দেবালয়ে,
ভেটিলেন একে একে
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে,
মাগিলেন "পদধূলি" শ্যামের আরোগ্য তরে!

৮

সসম্ভ্রমে কন তাঁরা "ক্ষিপ্ত তুমি হে নারদ!
ত্রিলোক অর্চ্চনা করে যাঁর পদ-কোকনদ,

তারে দিব পদ ধূলি ! দেবর্ষি ! গিয়েছ ভুলি'
আপনি পুরুষোত্তম
শ্রীকৃষ্ণের অবতার,
ব্যাধি তাঁর ? কি আশ্চর্য্য ! একি লীলা আরবার !"

৯

দেবর্ষি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরি করিলেন অন্বেষণ
কেবা দিবে পদধূলি শ্যাম-ব্যাধি-বিমোচন !
এস্ত সবে দ্বিধা ভরে, কেমনে সাহস করে,
ক্ষুদ্র নদী করিবারে
সিন্ধু-তৃষ্ণা নিবারণ !
পাবকে শুদ্ধতা দান শুনেছে কি কোন জন ?

১০

দেবর্ষি নিরাশ হয়ে ফিরিলেন দ্বারকায়,
শ্রীকৃষ্ণে কহিলা বিশ্বে পদধূলি মিলা দায় !
লীলাময় মৃদু হাসি সুধাইলা "ব্রজবাসী
একটুকু পদধূলি
দিল না আমারে হায় !
এমন নিষ্ঠুর তারা ছিল না যে ধারণায় !"

১১

উত্তরিলা মহামুনি "আমিত যাইনি তথা,
গোঁপ-গোপী-পদধূলি ভিক্ষা করা বাতুলতা !"
কহিলেন ভগবান, "অভিমানে যায় প্রাণ !
একবার হে দেবর্ষি !
দয়া করে সেথা যাও !
একটুকু পদরজঃ মোর তরে যদি পাও !"

১২

দেবর্ষি ত্যজিয়া কুণ্ঠা পশিলেন বৃন্দাবনে,
হেরিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে শত বর্ষ অদর্শনে

প্রেমভূমি মৃত প্রায়, প্রেতভূমি যেন হায়,
বিরহ-কাতর হৃদি
ব্রজবাসী উদাসীন,
কৃষ্ণ নাম জপি' শুধু যাপে দগ্ধ নিশিদিন !

১৩

নীরব তমাল কুঞ্জ, বাঁশরী বাজে না আর,
বহে না উজান আজি কালো বারি যমুনার '
ধবলী শ্যামলী নাই, কোথায় সুবল ভাই,
কায়াহীন ছায়া সম
আজি শ্যাম-বিনোদিনী,
মরমের ক্ষত-চিহ্নে খুঁজে শান্তি অভাগিনী !

১৪

অকস্মাৎ দেবর্ষির বীণা বাজে কৃষ্ণ নামে,
ক্ষণে যেন নব প্রাণ সঞ্চারিত ব্রজধামে !
ছুটে এসে প্রতিজন কহে "কোথা প্রাণ ধন"
দেবর্ষি জানায়ে পীড়া
চাহিলেন পদধূলি,
বজ্রাহত সবে যেন মর্ম্ম-গ্রন্থি গেল খুলি' !

১৫

প্রাণ-বঁধু রোগাকুল—পদধূলি প্রয়োজন—
কেমনে রহিবে স্থির কৃষ্ণ-প্রাণ গোপীগণ !
কহে সবে ব্যগ্র ভরে, "হে দেবর্ষি ! কৃপা করে
লও লও পদধূলি
যতটুকু চাই তাঁর !
বল বল আমরা কি যাব সাথে একবার !"

১৬

দেবর্ষি বিস্ময়ে কন "তোমরা পাগল হলে ?
পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সব দিলে রসাতলে ?

শ্রীকৃষ্ণ গোলকপতি, বিশ্বের পরম গতি
তাঁরে দিতে পদধূলি
চাহ সবে অকাতরে !"
অনন্ত নরক-ভীতি ভুলিলে কেমন করে !'

১৭

করযোড়ে সবে কয় "হে প্রভু ! হে দয়াময় !
জানি না নরক স্বর্গ পাপপুণ্য কারে কয় !
মোদের সর্ব্বস্ব সার, কৃষ্ণচন্দ্র প্রেমাধার,
মোরাও যে সব তাঁর,
ধর্ম্মকর্ম্ম সব তিনি।
কোথায় গোলক আর কেবা পতি নাহি চিনি !"

১৮

"লও লও পদধূলি"—কহে সবে আরবার—
"ভেট ত্বরা প্রিয়তমে ঘুচাও যাতনা তাঁর !"
গোপীগণ কথা শুনি, স্তম্ভিত নারদ মুনি,
কি গভীর কৃষ্ণ-প্রীতি,
কিবা আত্ম-সমর্পণ !
বুঝিলেন "গোপীপ্রেম" মুগ্ধ কিসে নারায়ণ !

রাজনীতি ও ধর্ম্ম।

[শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ]

ধর্ম্ম যখন কোন একটা বিশেষ জিনিষ বা প্রণালীর উপর নির্ভর করে তখনি সেটা সমস্ত লোকের ধর্ম্ম না হয়ে শ্রেণী বিশেষের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। আজ যদি আমি বলি, হেটমুণ্ড হয়ে গিরিগুহায় গিয়ে ভগবানের চিন্তায় রত থাকাই একমাত্র ধর্ম্ম, তা হলে দু চার জন মানলেও মানতে পারে কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষ তা কখনই মানতে রাজী হবে না। ভারতবর্ষ জোর করেই বলবে—"স্বভাবো অধ্যাত্ম।" যে প্রেরণার বশবর্ত্তী

হয়ে বুদ্ধ রাজ্যধন পরিত্যাগ করে—"ইহাসনে শোষ্যতু মে শরীরম"—(এই আসনেই আমার শরীর শুকিয়ে যাক্) এই পণ করে দীর্ঘ ছয় বৎসর কঠোর সাধনায় রত হয়েছিলেন, যে প্রেরণার বশবর্ত্তী হয়ে রাণা প্রতাপ সমস্ত পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে অনাহারে অনিদ্রায় গিরিগুহায় দিনাতিপাত করেছিলেন, সেই স্বভাব, সেই সহজ প্রবৃত্তি, যার জোরে মানুষ সাধারণের চোখে যা অসম্ভব তাকে সম্ভব করে তোলে তাই মানুষের ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ কেমন করে ভুলবে ভগবানের বাণী—"সহজং কুরু কর্ম্ম কৌন্তেয়!" যে কর্ম্মের মধ্যে মানুষ সমস্ত মন প্রাণ অতি সহজে ঢেলে দিয়ে আনন্দে পরিপ্লুত হয়ে উঠে, তা যত কঠিনই হক তার পক্ষে তা আহার বিহারের মত সহজ ও সরল। ৭২ দিন অনাহারে থেকে জীবন পাত করা আইরীস বীর ম্যাকসুইনির পক্ষে চব্য চোষ্য লেহ্য-পেয় খেয়ে জীবন ধারণ করার মত সহজ হয়েছিল।

তাই যেমন ভারতবর্ষ—একদিকে নির্জ্জনে ধ্যান নিরত যতিদিগকেও শ্রেষ্ঠাসন দিয়েছে অপর দিকে "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর" এই আদর্শকেও তেমনি স্থানই দিয়েছে।

"নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান"

ইহাই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বহুত্বের মধ্যে একত্ব এই আদর্শই বরাবর ভারতবর্ষে স্থান পেয়েছে। সৃজন পালন ও সংহার এই ত্রিমূর্ত্তিতেই ভারতের ভগবান ভারতের হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। মা অন্নপূর্ণাও ভারতের মা, করালবদনী কালীও ভারতের মা, ইহাই ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষকে বিচার করতে হলে এসব ভুললে চলবে না।

কিন্তু মানুষের এমনি স্বভাব যে সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির গণ্ডী দিয়ে একটা অচলায়তনের বেড়া দাঁড় করিয়ে তোলে। আর দেশের যখন অবনতি হয়, যখন স্বাধীন চিন্তার অভাব হয় তখন সব দিকে তা দেখতে পাওয়া যায়। তাই অধিকাংশ সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমে মঠে শুনতে পাই আমরা সাধু সন্ন্যাসী, রাজনীতির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই রাজনীতিকে যেন একটু তাচ্ছিল্য, ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখেই দেখা হয়, তাঁরা যেন মনে করেন রাজনীতি শঠতারই অপভ্রংশ মাত্র। তবে একথা সত্য পাশ্চাত্যের রাজনীতি দেখে বিচার করতে গেলে অনেকটা সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে হয়। কিন্তু স্বামী রামতীর্থের

কথায় বদ্ধজলে যেমন শেওলা গজায় তেমন ভারতবর্ষে ৫৬ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী গজিয়ে উঠেছে, অবশ্য মাঝে মাঝে সুন্দর মনোনয়নাম্নিগ্ধকর পদ্মফুলও ফুটে রয়েছে, তাই বলে কি সাধু সন্ন্যাসীরা সাধু হওয়ার বিরুদ্ধ মত প্রচার করে। যদি কোন এক যায়গার অধিকাংশ লোক ভগবানের পূজা করে ডাকাতি করতে বার হয় তবে কি বলতে হবে ভগবানের পূজা করাই অন্যায়? আজ রাজনীতি শঠের হাতে পড়ে শঠতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছে বলে কি রাজনীতিকে পরিত্যাগ করাই ধর্ম্ম হবে? আজ যদি আমার চোখ কুৎসিৎ দৃশ্য দেখে তবে কি তাকে উৎপাটিত করে দেওয়াই ঠিক হবে, না তাকে সংযত করে ক্রমশঃ সবার মাঝারে যে ভগবানের বিরাট রূপ তা দেখতে পারে তাই করতে হবে। অবশ্য অস্বীকার করবার জো নাই যে, আমাদের দেশে অধিকাংশ রাজনীতিবিদ্ পাশ্চাত্য রাজনীতিকেই রাজনীতি বলে মনে করেন—তাই বলে কি ভগবানের পরিপূর্ণ সত্বাকে খণ্ডরূপে দেখতে হবে, তাই বলে কি রাজনীতিকে তার প্রাপ্য আসন থেকে সরিয়ে দিতে হবে!

বহুদিনের সংস্কারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মঠ ও মন্দিরে যদি শুধু এই ভাবটা নিবদ্ধ থাকতো তা হলে বিশেষ কিছু বলবার থাকতো না। কিন্তু এ ভাব যেন ভারতের জাতীয় জীবনের ধমনীতে মজ্জায় মজ্জায় শিরায় শিরায় প্রবেশ করেছে। এই সঙ্কীর্ণতার হাত হতে পরিত্রাণ পেতে হলে বর্ত্তমান আন্দোলনকে একটু ভাল করে বুঝতে হবে। ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর ভীরুতার উপরই বর্ত্তমান ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত। তাই এই আন্দোলন কি "সর্ব্ব প্রদানেষু অভয় প্রদানম্" তার সাকার রূপ নহে! আজ সমস্ত ভারতবর্ষ পরমুখাপেক্ষী, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে অসমর্থ; যদি এই আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষ স্বাবলম্বন শিক্ষা করতে পারে তাহা কি ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হবে না! এই শাসনের ফলে বৎসর বৎসর কোটী কোটী টাকা বিদেশে যায় তার ফলে ভারতবর্ষ আজ অনাহার ও অনশন প্রপীড়িত, দুর্ভিক্ষ তার নিত্য-সহচর। ভারতের সব থাকতেও সে আজ ভিখারীবেশে দণ্ডায়মান। আমাদের দেশে খাদ্যের দুর্ভিক্ষ হয় না, অর্থের দুর্ভিক্ষ হয়। মনে পড়ে ১৯১৫ সালে যখন ত্রিপুরা জেলায় দুর্ভিক্ষ ও বন্যা-প্রপীড়িত স্থানে কর্ম্ম করিতে যাই তখন চাউলের মণ ৫৲ টাকা ছিল এবং লোকজন তাহাই কিনিতে অসমর্থ। সুজলা সুফলা বাংলাদেশে আজ ত্রিপুরা, কাল বাঁকুড়া, পরশু খুলনা এইতো আমরা দেখে আসছি। এই অনশনক্লিষ্ট

লোকদের মুখে একমুঠা অন্ন দেওয়া তো সকলেই ধর্ম্ম মনে করে, দরিদ্র নারায়ণের সেবা করা সকলেই ভাল মনে করে, তবে কেন যাতে দরিদ্র নারায়ণ দেশে না জন্মায় তার চেষ্টা করা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হবে না! চিকিৎসা শাস্ত্রে বলে রোগ হলে তার প্রতীকারের চেষ্টার চেয়ে রোগ যাতে না হতে পারে সে বিধান করাই প্রকৃষ্ট।

ইহাই তো রাজনৈতিক আন্দোলন। দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ বিধানের জন্যই রাজনীতি, তা যদি ধর্ম্ম না হয় তবে তো ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে শুধু একদল নেড়ানেড়ীর সৃষ্টি করতে হবে। অবশ্য কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে মানুষ ভুল পথ ধরতে পারে, তা ত জগতের সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যেই হয়ে থাকে। তাই রাজনীতিকে ধর্ম্মহতে পৃথক করে দেখা আমাদের সঙ্কীর্ণতা। যে দিন ভারত উন্নতির উচ্চ শিখরে আরূঢ় ছিল সে দিন সে রাজনীতিকে বাদ দিয়ে ধর্ম্মের ধ্বজা উড়ায় নাই। প্রজারঞ্জক রাজা রামচন্দ্র হিন্দুর কাছে ভগবানের অবতার, তিনিই তো রাবণের নিকট হতে রাজনীতি শিক্ষা করেছিলেন। তাতে তাঁর ভগবানত্বের হানি হয় নাই। আমরা অক্ষম দুর্ব্বল তাই এই রাজনীতি বিভীষিকা, আবার অপর দিকেও যে ধর্ম্ম বিভীষিকা আছে এই উভয়ই দূর করতে হবে। ধরতে হবে, মানতে হবে সেই ভগবানের পরিপূর্ণ সত্ত্বাকে যেখানে ধর্ম্ম রাজনীতিকে বাদ দিয়ে নয়, যেখানে রাজনীতি ধর্ম্ম, শঠতা নয়। তবেই আবার ভারতের ধর্ম্ম জীবন্ত হয়ে উঠবে, জাগ্রত হয়ে উঠবে, তবেই তার রাজনীতি পাশ্চাত্য রাজনীতির কলঙ্ক কালিমা থেকে মুক্ত হয়ে শারদ চন্দ্রমার ন্যায় স্নিগ্ধ ও মধুর হয়ে জগৎকে আনন্দ দেবে। আমরা জানি এই সামঞ্জস্যই ভারতের মাধুর্য্য ও বিশেষত্ব।

বন্দী-জীবন

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল]

কালের মহিমা অনন্ত। কাল অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া দেয়, অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি আনে। কালের মহিমায় অপ্রিয়ের স্মৃতিও প্রিয় হইয়া ওঠে।

মোটের উপর অতীতের স্মৃতি বড় মিঠে, যেন বীণার তারের সুপ্ত ঝঙ্কারের মত আঘাত করিলেই মধুর ভাবে ঝঙ্কারিয়া ওঠে।

অনেক সময় অতীতের স্মৃতি বড় পীড়াদায়ক। কিন্তু সে পীড়া বোধের মধ্যেও যেন সুখ থাকে। তখন যে চিত্তের মর্ম্ম স্থানটি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অনাবৃত হইয়া যায়। সে সময় যে নিজের সহিত বড় নির্জ্জনে বড় গোপনে আলাপ হইতে থাকে।

সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা যেন জীবনভোর আমাদের সহিত রঙ্গ করে, কিন্তু একান্তভাবে কোনটাই বহুদিন স্থায়ী হয় না সবি যায় কেবল স্মৃতিটুকু অবশিষ্ট থাকে।

স্মৃতিপটে অনেক ছোট জিনিষ বড় হয় ও বড় জিনিষ ছোট হইয়া যায়, আবার অনেক জিনিষ মনের কোণে এমনি ডুব মারে যে খুঁজিয়া পাওয়া দায় হয়।

বারানসী ষড়যন্ত্র মামলায় আমার সাজা হয়। ১৯১৫ সালের ২৬শে জুন ধরা পড়ি ও ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ই তারিখে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডপাই ও সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। কিছু দিন কাশীর জেলে থাকিয়া আগষ্ট মাসে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হই। ১৮ আগষ্ট আন্দামানের জেলে আসিয়া প্রবেশ করি। পুনরায় ইচ্ছাময়ের অভিপ্রেতানুসারে ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সম্রাটের ঘোষণা পত্রানুসারে মুক্তি লাভ করি।

এই কয়েক বৎসর লইয়াই আমার বন্দীজীবন। এই বন্দীজীবন অবলম্বন করিয়া যে সংস্পর্শে বন্দী হইয়াছিলাম তাহারও কতকটা পরিচয় দিব ইহাই আমার অভিপ্রায়। ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের কয়েকটি পরিচ্ছেদ যাহাতে ঠিক মত লিখিত হইতে পারে এই সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়াই আজ লিখিতে বসিয়াছি।

ভারতের অদৃষ্ট এক সুমহান সন্ধিক্ষণের ভিতর দিয়া উধাও হইয়া ছুটিয়াছে। অন্তরে ও বাহিরে সে ভীষণ বিপ্লব কাহিনী। নিয়তির গোপন ডাকে আপনার সুনির্দ্দিষ্ট পথে অথচ যেন মনে হয় নিজের খেয়াল মত ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া ফিরিতেছে আমিও সেই নিয়তির বশেই ঐরূপ একটি ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলাম।

আমার মত আরও কত যুবক স্বীয় মর্ম্মকোণের অব্যক্ত বেদনায় চঞ্চল হইয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিধাতার অভীষ্ট সাধনের জন্যই দলবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; সেই দলের অভ্যন্তরীণ পরিচয় যাহা কর্ম্মের বাহাড়ম্বের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিবার বাসনা

হৃদয়ে বহুদিন যাবৎ পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। আজ তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়াস করিতেছি।

ঘটনাকেই অনেক সময় আমরা বড় করিয়া দেখি, কিন্তু ঘটনার অন্তরালে যে মহাশক্তির খেলা থাকে, তা সে যত ক্ষুদ্র ঘটনাই হউকনা কেন, তাহা যে ঘটনার চাইতেও বহু মূল্যবান্ ইহা আমরা ভাল করিয়া বুঝি না। সফলতার মোহ প্রতি পদে আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। সে মোহ বিচার দ্বারা ছিন্ন হইলেও প্রাণ সে মোহাবেশ কাটাইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু বড় বড় ঘটনার চাইতেও জীবন-যাপনের ছোট খাট খুটিনাটিটিও ছোট নহে। ঘটনাটার সূত্রপাত চিন্তাজগতেই হইয়া থাকে।

এই উপলক্ষে ব্যক্তির চরিত্র আলোচিত হইলেও উহা ব্যক্তিগত ভাবে করা হইবে না। ব্যক্তির পরিচয় ব্যতিরেকে সমষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই জন্য ব্যক্তির চরিত্রের আলোচনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

এই পরিচয় দিতে গিয়া নিজের ও নিজের দলের বহু ছিদ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাই বলিয়া কি যে সকল দুর্ব্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা অন্তরে অন্তরে আমাদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে গোপন রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিব? ব্যর্থ ত হইবেই, কারণ একদিন না একদিন সত্য ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আর গোপন করিতে গেলে কেবল যে সত্যের অপলাপ করা হইবে তাহা নহে তাহাতে আমাদের পঙ্গুত্ব আরও বাড়িয়া যাইবে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" কথাটির সার্থকতা বুঝিতে পারি নাই।

পূর্ব্ব-পরিচয়।

(১)

কলিকাতা রাজাবাজারে একটি ছোট্ট দুইতলা খোলার ছাতের বাড়ী ছিল। দেখিলে মনে হয় যেন গরীবদিগের আবাস স্থান। ইহা ট্রাম conductor বা ঐরূপ জাতীয় লোকদিগের মেস ছিল। ইহারই উপর তলায় একটি ঘরে শ্রীশশাঙ্কমোহন হাজরা নামে একটী যুবক থাকিতেন। তিনি যখন ধরা পড়েন তখন বোমার খোলের সহিত যোগ ও সাধন বিষয় কয়একটি প্রবন্ধও তাঁহার ঘর হইতে পাওয়া যায়। বিচার কালে কোনও বাবু ঐ প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে বলেন যে ওগুলি কেবল ছলনা মাত্র, লোকদিগকে বিপথগামী করিবার

একটি উপায়। আমরা কিন্তু জানি তাহা মোটেই নহে। আমরা সত্য সত্যই ঐ সাধন জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভগবানই যে সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা ইহা আমরা কেবল মুখেই বলিতাম না, সত্য সত্যই গভীর শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস করিতাম। স্বীয় কর্ম্মোদ্ধারের জন্যই কেবল ভগবানকে টানিয়া আনিতাম না, ভগবানের অধিনায়কত্বের বিষয় লইয়া আলোচনায় ও ভাবনায় কতদিন এমন কি কত রাত্রিও অতিবাহিত হইয়াছে।

এই যে মহা আন্দোলন ভারতের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে আমরা বিশ্বাস করি, ইহাও সেই তাঁহারই ইঙ্গিতে সাধিত হইতেছে। যে ভাবের অব্যর্থ প্রেরণায়-ভারতের শত শত যুবক মরণ বরণ করিয়া বিষম বিপদের মুখেও কৌতুকে অগ্রসর হইয়াছেন, সে প্রেরণার বলে তাঁহারা অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ধীর সংযমীর ন্যায় সহ্য করিয়াছেন, এই ভাবের বন্যা কি কোনও ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা দেশে আনীত হইয়াছে? না ইহার স্থায়িত্ব কোনও ব্যক্তি-বিশেষের মত অথবা মরণ বাঁচনের উপর নির্ভর করে?

যখন নিতান্ত বালক ছিলাম তখন হইতেই স্বদেশ উদ্ধারের সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি। ইহা ত আমি কাহারও নিকট হইতে পাই নাই। ইহা আমার প্রাণে প্রাণে অত অল্প বয়সে কে বলিয়া দিল? বাল্যকাল হইতেই যে এই বিষয় লইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের সহিত আলোচনা করিয়া আসিতেছি। তখনও ত স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত পর্য্যন্ত হয় নাই। আর কেবল যে আমার মনেই এইরূপ ছিল তাহা নহে। পরিণত বয়সে অনেকের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি, আমার মত দেশে আরও অনেকেই আছেন। যেন মনে হয় আপনার অভীষ্ট সাধন করিবার জন্য ভগবান পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন করিয়া আসিতেছেন।

(২)

১৯১৫ সাল ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঐ সালে বিপ্লবের যে বিরাট আয়োজন পণ্ড হইয়া যায়, এত বড় আয়োজন, ৫৭ সালের মহা বিপ্লবের পর এক পাঞ্জাবের কুকা বিদ্রোহ ছাড়া আর হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই চক্রান্ত ধরা পড়িবার পরই "ভারত রক্ষা" আইনের পত্তন হয়। তদানীন্তন হোম মেম্বর ক্র্যাডক সাহেব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত আইনের প্রস্তাব উত্থাপন কালে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি বলেন—

"We had had anarchism for a long time in Bengal, but the situation in the Punjab was serious, in Bengal it was less so" যথার্থই ভারতের অবস্থা সে সময় নিতান্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তবে বাঙ্গলার বিষয়ে ক্র্যাডক সাহেবের অভিজ্ঞতা সে সময় অল্পই ছিল। কিছুদিন পরে ক্র্যাডক সাহেব স্বীকার করিয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের বিপ্লব-পন্থীদিগের সহিত বাঙ্গলার যোগাযোগ সম্বন্ধে প্রথমে তাঁহাদিগের যে ধারণা ছিল পরে সে ধারণার পরিবর্ত্তন হয়।

উত্তর ভারতের বহু ষড়যন্ত্র মামলাতেই অনেক বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। অনেকের ধারণা ঐ সকল কথার অধিকাংশই মিথ্যা। অনেকে আমায় বলিয়াছিলেন যে পুলিশ সব মিথ্যা সাজাইয়া কেবল মকর্দ্দমা খাড়া করিয়াছে। সত্য সত্যই দেশে ওরূপ কিছু হয় নাই। ইঁহাদের এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে অন্তর-জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকিতাম। মনে করিতাম দেশবাসীর আত্মশক্তিবোধ এতই লোপ পাইয়াছে যে তাঁহাদের স্বজাতীয়েরা ঐরূপ কিছু করিতে পারেন ইহা তাঁহাদের ধারণাতেই আসে না। কিন্তু অন্তরের অসহিষ্ণুতায় মনের কথা ত খুলিয়া বলিতে পারিতাম না, সেই জন্য জ্বালা আরও বেশী বোধ হইত। কোমাগাটা মারুর শিখ যাত্রিদিগকে কানাডায় অবতরণ করিতে না দেওয়ায় তাঁহাদিগের মনে যে আগুন জ্বলিয়াছিল, তাহারই অগ্নিকণা যখন দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল ভারতের একপ্রান্তে বসিয়া বসিয়া তাহাই আমরা আশায় বেদনায় চঞ্চল হইয়া অসহিষ্ণুর মতই নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। পাঞ্জাবে যাঁহারা আমাদিগের লোক ছিলেন তাঁহাদিগকে বলিয়া রাখা হইয়াছিল যে কোমাগাটা মারুর যাত্রীরা দেশে পদার্পণ করিলেই যেন তাহাদিগকে দলে টানিয়া লওয়া হয়।

কোমাগাটা মারুর যাত্রীরা দেশে পদার্পণ করিতে করিতেই এক মহা কাণ্ড হইয়া গেল। আমাদের আশা আরও বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কানাডা ও ক্যালিফর্ণিয়া হইতে দলে দলে আরও কত শিখ আসিতে লাগিল। এই সকল দল ভারতে আসিবার পথে স্থানে স্থানে নামিয়া শিখ পুলিস ও শিখ রেজিমেণ্টে যাইয়া বিপ্লবাগ্নি ছড়াইতে ছিলেন। ইহার বহুদিন যাবৎ ভারতের বাহিরে থাকায় গোপনে কিরূপে ষড়যন্ত্র করিতে হয় তা মোটেই জানিতেন না। তাই প্রকাশ্য ভাবে জাহাজে জাহাজে, বন্দরে বন্দরে, ইঁহারা বিপ্লব-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে আসিতেছিলেন। ইহারই ফলে ভারত গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট

সতর্ক হইয়া যান। যেমন যেমন শিখদল স্বদেশে আসিয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন তেমন তেমন সরকার বাহাদুরের তরফ হইতেও তাঁহাদের রীতিমত অভ্যর্থনা হইতে লাগিল। এইরূপ একটি দলের প্রায় তিন শত ব্যক্তিকে সোজা মুলতান জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহাঁদের অনেক-কেই সরকার বাহাদুর নেতৃস্থানীয় বলিয়া মনে করেন। ইহাদের অনেকের নিকট বহু অর্থও ছিল। ইহারা আমেরিকায় কএকবৎসর ধরিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা প্রায় সবই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এসব টাকা সরকার বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করেন। ইহাদের একজনের নিকট প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ছিল।

অনেকে আবার স্বীয় উপার্জ্জিত সকল অর্থই California যুগান্তর আশ্রমে দিয়া আসিয়াছিলেন। যে সকল দল সরকারের নজর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন তাঁহারা আসিয়া পাঞ্জাবে দলবদ্ধ হইতে লাগিলেন। শিখদিগের ধর্ম্ম মন্দিরগুলির নাম গুরুদ্বারা। এই সকল জায়গায় শিখদিগের পুরোহিত-গণ বাস করেন। ইঁহাদিগকে শিখগণ গ্রান্থীজি বলেন। এক একটি গুরুদ্বারা এক একজন গ্রান্থী আছেন। এই সব গুরুদ্বারা গুলিই বিপ্লবপন্থী শিখদিগের সম্মিলন কেন্দ্র হয়। এইরূপ একটি গুরুদ্বারায় বসিয়াছিলাম। একটি শিখ আসিয়া খবর দিলেন আজ অমুক অমুককে অমুক গুরুদ্বারায় ঢুকিতে দেখিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছি। অল্পক্ষণ পরেই দেখি সেই দলের মুখ্য ব্যক্তিগণ আমাদের গুরুদ্বারায় আসিয়া উপস্থিত। অর্থের কথা উঠিতেই তৎক্ষণাৎ তাঁহারা গোল গোল বড় বড় সোণার চাকতিগুলি আমাদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। আমেরিকার স্বর্ণমুদ্রাগুলি গুণিয়া দেখা গেল প্রায় সহস্র মুদ্রা। প্রত্যেক দলই এইরূপ করিয়াছিলেন। বিপ্লব কার্য্যে অকাতরে স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থ দান করিতে ইঁহাদিগকে যেমন দেখিয়াছি বাঙ্গালা দেশে সেরূপ দেখি নাই। অবশ্য আমেরিকা ফেরত শিখদিগের মধ্যেই এরূপ উৎসাহ ও আন্তরিকতা দেখিতে পাই। তা ছাড়া পাঞ্জাবের অন্য অধিবাসিরা প্রায় কেহই ইঁহাদের সহিত সহানুভূতি দেখান নাই। কেবল পাঠান ও শিখ সৈনিকের সহিত ইঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তবে শিখ জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনাপ্রসূত একতা ভারতের অন্যান্য জাতির অপেক্ষা ঢের বেশি।

যাঁহারা আমেরিকা হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের অধিকাংশই তথায়

কুলি মজুরের কাজ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার ত্রিশ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয় তিনি ক্যালিফোর্ণিয়ায় চাষের কাজ করিয়া বেশ ধনী হন।

ইঁহাদের বহু আত্মীয় স্বজনেরা ভারতের সৈনিক দলভুক্ত ছিলেন। ভারতে আসিয়াই ইঁহারা সৈনিকদিগের সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া দেন। এই সময় বাঙ্গালার সহিত পাঞ্জাবের সংযোগ সাধিত হয়। অনেক গুণ থাকিলেও ইঁহাদের organising power বাঙ্গালাদেশের মত ছিল না। বাঙ্গালার সহিত সংযোগের পর হইতে বেশ সুসম্বদ্ধরূপেই কার্য্য আরম্ভ হয়। উত্তর ভারতের প্রায় সকল সৈনিকাবাসেই আমাদের লোকের যাতায়াত আরম্ভ হয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বান্নু হইতে আরম্ভ করিয়া দানাপুর পর্য্যন্ত কোনও সৈনিকাবাস বাদ দেওয়া হয় নাই। প্রায় সকল রেজিমেণ্টই কথা দেন যে প্রথমে তাঁহারা কিছুই আরম্ভ করিবেন না তবে বিপ্লব আরম্ভ হইলে বিপ্লবকারিদিগের সহিতই যোগ দিবেন ইহা নিশ্চয়। কেবল লাহোর ও ফিরোজপুরের রেজিমেণ্ট সর্ব্বপ্রথমেই কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রতিশ্রুত হন। সরকার বাহাদুর কিন্তু প্রথম এতটা ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই যে ষড়যন্ত্রকারীরা এত গভীর ভাবে বিপ্লবের আয়োজন করিতেছে। তা না হইলে এত দুর অগ্রসরই হইতে পারা যাইত না। বাঙ্গালার পুলিশ বিভাগের একজন deputy superintendent তাঁহার একটি গুপ্ত চরকে এই দলে ঢুকাইয়া দেন এই ত্রিপাল সিংহই শেষে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দেয়। ক্রমশঃ

তাই এত ভালবাসি

[শ্রীচারুবালা দত্ত গুপ্তা]

(১)

শশী জিনি' তব আঁখি মনোরম
ঢল ঢল রূপরাশি
হাসিটী তোমার জোছনা মধুর
নিখিল আঁধার নাশি',
তুমি নিরমল তুমি মনোহর
তাই এত ভালবাসি।

(২)

(তুমি) অমল সরসে কুমুদ কমল
বিকচ আনন শশী,
অলক্ত রঞ্জিত নধর অধর
তরুণ অরুণ হাসি,
তুমি নিরমল তুমি মনোহর
তাই এত ভালবাসি।

(৩)

উছলে যমুনা দিগ দিগন্তর
মধুর সুতানে বাঁশী,
গগনে পবনে অসীমে সসীমে
চপলা ঝলকে হাসি,
তুমি নিরমল তুমি মনোহর
তাই এত ভালবাসি।

(৪)

জলদবিহীন সুনীল অম্বর
শরত প্রভাত হাসি,
শ্যামল শোভন নধর বরণ
ঝুমুকা কুসুম রাশি,
তুমি নিরমল তুমি মনোহর
তাই এত ভালবাসি।

(৫)

পূরব গগনে উষার মাধুরী
অধরে অরুণ হাসি,
সু-পীত বরণ বসন শোভন
ফুটন্ত অতসী রাশি,
তুমি নিরমল তুমি মনোহর
তাই এত ভালবাসি।

চন্দ্রাবাই

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।]

(১)

সেদিন বর্ষার ঘনকৃষ্ণ মেঘগুলি সন্ধ্যার আকাশে একটা গভীর বিষাদের ছায়া আঁকিয়া দিতেছিল; বিরহবিধুরা সন্ধ্যারাণীর বিষাদময়ী মূর্ত্তিতে একটা অবসাদের যবনিকা পড়িয়াছিল, দূরে কোন্ গ্রাম্য পথ হইতে বিরহের করুণ-রাগিণী ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল। এমনতর চিত্তচাঞ্চল্যের সময়ে বিরহ মথিত হৃদয়ে—"এ ভরা বাদরে, এ মাহ ভাদরে শূন্য মন্দিরে মোর" বসিয়া থাকিতে বড় বিরক্তিকর বোধ হইতেছিল; তাই মনটা একটু প্রফুল্ল করিবার জন্য বন্ধুবর অধ্যাপক বসন্তকুমারের বাসায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে আমাদের আশৈশব বাল্যবন্ধু সুশীলচন্দ্রকে দেখিয়া খুব আনন্দিত ও চমৎকৃত হইলাম। অনেকদিন হইতে তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সম্প্রতি তাঁহার বাসস্থানের কোনও সন্ধান না জানায় সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। আজ না চাহিতে জল পাইয়া চাতকের মত বিশেষ পুলকিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার বেদনাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানি দেখিয়া বড় ব্যথিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। সুশীলকেত আমরা বাল্যকাল হইতেই ভালরকম চিনিতাম, তাঁহার ন্যায় হাস্যরসিক বন্ধু জীবনে আর কখনও পাই নাই। তাঁর সদাপ্রফুল্ল হাসিভরা মুখ দেখিয়া কত দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা পাইয়াছি, কত বুক ভাঙ্গা ব্যথা ভুলিয়া গিয়াছি। কই এমনত তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তাই তাঁহার এই অচিন্তিত ভাব—পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলাম। আমাদের বিস্ময়ের কারণটাও কম ছিল না। যাঁহাকে এ পর্য্যন্ত কখনও অন্যমনস্ক দেখি নাই, কলেজের প্রফেসার আসিতে বিলম্ব হইলে সমস্ত ক্লাসটি যাহার গল্পগুজবে সরগরম হইয়া থাকিত, আজ সহসা তাঁহার মুখে গাম্ভীর্য্যের রেখা দেখিলে স্বতঃই একটা উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রথমে কোন উত্তর পাইলাম না, কিন্তু আমাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্য উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অথবা তাঁহার আবেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইলে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"কে বলে স্ত্রী পুরুষে নিষ্কাম বন্ধুত্ব সম্ভবে না? জীবনে মাঝে মাঝে মানুষ প্রেমের এমন একটা স্তরে আসিয়া পৌঁছে, যেখানে স্বার্থের কলুষ নিশ্বাস

বহিয়া প্রণয়ের পেলব কুসুমটিকে ম্লান করিয়া দিতে পারে না, যেখানে কামনার দুষ্টগন্ধ উঠিয়া প্রণয়ের স্বভাবসুন্দর আবহাওয়া নষ্ট করিয়া দেয় না। এমন এক প্রীতির গ্রামে যখন মানুষ উঠিতে পারে, তখন সে সেই অচ্ছেদ্যপ্রীতি-বন্ধনের ভিতর দিয়াই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, প্রভাতের আলো, আকাশের নীলিমা এবং তাহার মাঝে ইন্দুর হাসি উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই তাহার নিষ্কাম সখ্যভাব সম্ভবপর। আমারি জীবনে এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। অহঙ্কার করিতেছি না, আপনাকে সাধারণ মানুষের চেয়ে বড় বলিতেছি না, কিন্তু সত্যি সত্যি মঙ্গলময় ঈশ্বরের এক অখণ্ডবিধানে আমার হৃদয়ে সে নবভাবের ধারা বহিয়াছিল। এখনও আমার সেই অতীত স্মৃতি তাহার অনির্ব্বচনীয় সুখশান্তি লইয়া বর্ত্তমানের মত আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

"সেবার এম্ এ পরীক্ষা দিয়া কয়েকটা মাস পশ্চিমে বেড়াইতে যাইব স্থির করিলাম। তারপর আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় নাই। হয়ত তোমাদের মনে আছে আমি প্রয়াগে যাইবার জন্য বড় উৎসুক ছিলাম। এলাহাবাদে আমার এক আত্মীয় থাকিতেন, তাঁর কাছে কিছুদিন থাকিয়া এলাহাবাদ সহরটা ভাল করিয়া দেখিয়া আসিব ভাবিলাম,তারপর যা হক কপালে থাকিলে আগ্রা দিল্লীটাও বেড়ান হইতে পারে। কিন্তু আসলে আমরা যেমনটি ভাবি তা সেই লীলাময় ঠাকুরটির ইচ্ছায় ঠিক তেমনটি হয়ে উঠে না। আমরা মনে করি আমরা যা স্থির করিব তা যেন কবিতার মিলের মত, ছন্দের গতির মত একটা সুশৃঙ্খল পদ্ধতির অনুসরণ করিবে; কিন্তু তাহা না হইয়া মাঝে মাঝে কোথা হইতে একটা যতিভঙ্গ একটা বেসুরা ধ্বনি আসিয়া পড়ে। আমার ভাগ্যেও ঠিক এমনিতর হইয়াছিল। তখন কিছুদিন পূর্ব্বে এক প্রকাণ্ড ঝড়ে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাইবার রেলওয়ে লাইনটা স্থানে স্থানে খসিয়া গিয়াছিল। কর্ম্মচারিদিগের অনবধানতায় উহা কর্ত্তৃপক্ষেরা জানিতে পারে নাই। ঠিক মধ্যরাত্রে দুইটি ট্রেণ দুধার দিয়া আসা যাওয়া করিতেছিল, হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিতে পাইলাম, চারিদিকে ভীষণ গণ্ডগোলের মধ্যে এইটুকু বুঝিলাম যে দুইটি ট্রেণে ধাক্কা লাগিয়াছে। আমি একলা মানুষ, সঙ্গে জিনিষপত্র তেমন কিছুই ছিল না, চেষ্টা চরিত্র করিয়া নামিয়া পড়িলাম। রাত্রি অধিক হইয়াছে, কিন্তু তখন জ্যোৎস্নাপক্ষ; জ্যোৎস্নাপ্লাবনে উচ্চাবনত বনভূমি হাস্যময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কিছুদুর অগ্রসর হইলাম, দেখিলাম জনমানবের চিহ্নপর্য্যন্তও নাই কেবল অদূরে বনপক্ষীর কলধ্বনিমাত্র শোনা যাইতেছে।

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, একস্থানে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি ঈষৎ চলিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া মনে হইল। অগ্রসর হইলাম, দেখিলাম যেন সেই কৌমুদীপ্লাবিতা কাননকুন্তলা বনভূমির উপর বনদেবী অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা যেন সেই উজ্জ্বল নিশীথে নক্ষত্রলোকবিচারিণী কোন জ্যোৎস্নাবালা ধরার মাধুর্য্য উপভোগ করিতে আসিয়াছেন। পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিলাম বালিকা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসিনী, বয়স সতর আঠারোর কাছাকাছি। মুখে চোখে তার লাবণ্যের এমন একটা দীপ্তি যে তাহাকে স্বতঃ পুণ্যহৃদয়া ও সরলান্তঃকরণা বলিয়া মনে হয়। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম বালিকার পিতা এলাহাবাদের এক প্রসিদ্ধ আইনব্যবসায়ী, পিতার সহিত কলিকাতা হইতে ফিরিবার মুখে এই দৈব দুর্ঘটনায় এখানে নামিয়া পড়িয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তায় আদৌ সঙ্কোচের ভাব ছিলনা। উন্মুক্তবাতাসে অধিকক্ষণ থাকিলে অসুস্থতাবোধ হইতে পারে এইজন্য আপনা হইতে আমাকে তাহার সহিত সম্মুখস্থ ভগ্নকুটীরে আসিতে অনুরোধ করিল। আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। হঠাৎ সেই স্তিমিতালোকের আবছায়ায় দেখিতে পাইলাম বালিকার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সাপ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। বালিকাটি দেখিতে পাইয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। আমি দুর্গার নাম স্মরণ করিয়া একটা পাথর কুড়াইয়া নিয়া সবলে উহার দিকে নিক্ষেপ করিলাম। ঈশ্বরের করুণা বশেই হউক অথবা বালিকার পরমায়ুর জোরেই হউক উহা সাপের মাথায় আঘাত করিল, সাপটিও হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া পলাইয়া গেল। বালিকাটি তাহার আধ আধ হিন্দিবাক্যে তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে চারিদিকে উষার অরুণ ছটা দেখা দিল, সেই নবোদিত উষার আলোকে বালিকার রূপজ্যোতি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এইরূপ অনুপম লাবণ্য এমন অনিন্দ্য স্বাস্থ্য বাঙ্গালা দেশে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। চোখ দুটি যেন কোন্ পুণ্যালোকে বিভাসিত হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, টানা টানা ভ্রূযুগের উপর ললাটদেশ শরতের আকাশখণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, দক্ষিণ ভ্রূর উপরে একটি ছোট তিল শরতের আকাশে একটি মেঘের টুকরার মত বৈচিত্র্যে সেই শোভা যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে, বামগণ্ডের এক পাশে একটি আচিল ক্ষুদ্র তারার মত চিক চিক করিতেছে।

প্রভাত হইয়া আসিল। আমরা তাহার পিতার অন্বেষণে বাহির হইলাম। একা এই পূর্ণবয়স্কা বালিকার সঙ্গে যাইতে আমার বেশ একটু সঙ্কোচ বোধ

হইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখে চোখে সঙ্কোচের কোনও চিহ্নই দেখিলাম না। কিছু দূর যাইয়া আমরা সেখানকার রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসনটা শোন নদীর তীরে নাম ডিরি অন্ সোন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি বালিকার পিতার নাম শ্রীওঙ্কার লাল চতুর্ব্বেদী, এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহার জীব। তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে ষ্টেসনে কন্যার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। বালিকার নিকট রাত্রিসংক্রান্ত সকল ঘটনা শুনিয়া তিনি আমাকে বহুবিধ ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তারপর তিনি বলিলেন সোনের তীরটি তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে, তিনি কয়েক দিন ঐ স্থানে থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন; কোনও কাজের ঠেকা না থাকিলে আমাকেও দুই চার দিন সেখানে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কন্যাও পিতার সহিত সেই অনুরোধে যোগ দিল এবং আমি যখন তাঁহাদের অনুরোধে সম্মতি জানাইলাম, তখন তাঁহারা খুবই আনন্দিত হইলেন। আমিও কিছুদিনের জন্য তাঁহাদের সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত হইব না ভাবিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। তারপর সোন নদীর তীরে কত মধুর সন্ধ্যা তাহার সহিত অতিবাহিত করিয়াছি, সেই দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির মৌন সাধনার মাঝে কত আমোদ গল্পে কত সাহিত্য চর্চ্চায় কত পুলকময় সন্ধ্যার আলোকে দুইটি হৃদয় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল।

(২)

"আজ ও মনে পড়ে সেই বিচ্ছেদ কাতর আঁখি দুটি যাহা আমার এলাহাবাদে বিদায়কালে গৃহদ্বারে পথ চাহিয়া সন্ধ্যাতারার মত ফুটিয়াছিল। যদিও অল্পদিনের জন্য আমাদের এ বিচ্ছেদ কারণ তাঁহাদের ও শীঘ্রই এলাহাবাদে ফিরিয়া যাইবার কথা তথাপি চন্দ্রার কাতর মুখখানি আমার মনে এমনি আঁকিয়া গিয়াছিল যে প্রকৃতই পথে আমার কান্না আসিতেছিল। বলিতে ভুলিয়াছি মেয়েটির নাম চন্দ্রাবাই।

কিন্তু ভগবান যার কপালে দুঃখ লিখিয়াছেন তার সুখের আশা মিটিবে কেন? এলাহাবাদে আসিয়া শুনিলাম আমার আত্মীয়টী সেখান হইতে কোথায় বদলি হইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক যখন আসিয়া পড়িয়াছি তখন না দেখিয়া আর ফিরিব না স্থির করিলাম। একেবারে কৃষ্ণা হোটেলে গিয়া উঠিলাম।

কৃষ্ণা হোটেলটি মোটের উপর মন্দ নয়, আহার শয়নের ব্যবস্থা ভালই। এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদ তুল্য নূতন প্রস্তর নির্ম্মিত সেনেট গৃহের অতি নিকটেই ইহা অবস্থিত। এলাহাবাদে পৌছিবার পরের দিন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহগুলি দেখিয়া আসিলাম। বেড়াইয়া আসিয়া শরীরটা বড় খারাপ লাগিতে লাগিল, মাথায় একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। না খাইয়া শুইয়া পড়িলাম, মধ্যরাত্রে নিদ্রা ভাঙ্গিলে বুঝিলাম খুব জ্বর হইয়াছে, তারপর জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হইয়া রহিলাম। এইরূপ কদিন অচেতন অবস্থায় ছিলাম জানিনা। যখন জ্ঞান হইল দেখিলাম আমার শয্যার সম্মুখস্থ টেবিলের বইগুলি বেশ গুছান রহিয়াছে, এই লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে যেন একটা লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম চন্দ্রা একহাতে পথ্য ও আরেক হাতে এক গ্লাস জল লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে। চন্দ্রাকে এখানে দেখিয়া বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমার অচেতন অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে দেখিয়া চন্দ্রা বড় আহ্লাদিত হইল, তাহার মুখের প্রফুল্লভাব দেখিয়া আমি ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। তারপর সে আপনা হইতেই আমার শিয়রে বসিয়া একে একে সব কথা বলিতে আরম্ভ করিল। আমার এত অধিক জ্বরে আমাকে এরূপ অচেতন অবস্থায় দেখিয়া কৃষ্ণাহোটেলের কর্ত্তৃপক্ষেরা আমার কোনও আত্মীয়ের ঠিকানা পাইবার জন্য আমার পকেট অনুসন্ধান করিয়া ওঙ্কারলাল চতুর্ব্বেদী মহাশয়ের ঠিকানা পাইয়া তাঁহাকেই তার করিয়াছিল এবং তিনি কন্যাকে লইয়া অচিরে কৃষ্ণা হোটেলে উপস্থিত হইয়া আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। চন্দ্রা পিতাকে কোনও নার্স রাখিতে না দিয়া নিজেই সমস্ত শুশ্রূষার ভার লইয়াছে। এমন সময় চন্দ্রার পিতা আমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনিও আমাকে জ্ঞানাবস্থা ফিরিয়া পাইতে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম চন্দ্রার দিবারাত্র শুশ্রূষার গুণেই আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি। আমার তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল না, তাই চন্দ্রাও তাহার পিতার দিকে করুণ নেত্রে তাকাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। আমার চোখ হইতে দুই ফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

ক্রমে ক্রমে আমি আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলাম। বেশ একটু সারিয়া আসিলে চন্দ্রা আমাকে তাহাদের বাটীতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ী লুকারগঞ্জে এলাহাবাদ ষ্টেসনের নিকটে। লুকারগঞ্জ রোডটি বেশ প্রশস্ত,

দুই ধারে বড় বড় বৃক্ষের শ্রেণী বহু শাখা প্রশাখা প্রসারিত করিয়া একটা স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

একদিন আমি চন্দ্রা ও তাহার ছোট এক মামাত ভাই আমরা কয়জনে মিলিয়া খস্রুবাগে বেড়াইতে গেলাম। খস্রুবাগ লুকারগঞ্জের খুব নিকটে। এখানে খস্রু ও তাঁহার বেগমের এবং আরও কয়টি সমাধি রহিয়াছে। সমাধির চারিধারে একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান। সেই উদ্যানের মধ্যে এখন সমস্ত সহরে—জল সরবরাহ করিবার জন্য প্রকাণ্ড কল রহিয়াছে। আমরা ঐ জলের কল দেখিয়া সমাধিস্থানগুলি দেখিতে লাগিলাম। কোন্ এক যুদ্ধে জাহাঙ্গীর তনয় খস্রু বিদ্রোহী হইয়া এখানে অন্তিম শয়নে শুইয়া আছে। আজ মনে পড়িয়া গেল মোগল বাদশাহদের সেই লোকাতীত ঐশ্বর্য্য, তাহা এখন কোন্ মায়াপুরীর খেলার মত অতীতের দর্পণ তলে, এখন শুধু ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। আছে কেবল এই রকম কয়েকটি স্মৃতি তাহা কালের সর্ব্ববিধ্বংসী ক্ষমতাকে উপহাস করিয়া এখনও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাহাজাদা খস্রু ও তাঁহার বেগমের কবরের পাশে আর একটি কবর দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহা খস্রুর এক প্রিয়পাত্রী পানওয়ালীর কবর, একমাত্র ভালবাসার দাবীতে পানওয়ালী ঐখানে স্থান পাইয়াছে। শুনিয়া ঐ কবরের উপর গিয়া বসিতে ইচ্ছা করিল, সঙ্গে সঙ্গে খস্রুর উপর একটু শ্রদ্ধার ভাবই আসিল। এমনি আপনকরা ভালবাসা যাঁ সামান্য পানওয়ালীকে একেবারে নিজের কাছে টানিয়া লইয়াছে তাহার চরণে মাথা নোয়াইতেই হয়। এমন আপনাভোলা প্রাণ-নিঙড়ান ভালবাসা কয়টা-লোকের ভাগ্যে ঘটে কে জানে, তাই ইহার সম্মানের জন্য আমরা ঐ কবরের পাশে আসিয়া বসিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল; স্থানটি নির্জ্জন। এই নির্জ্জন পবিত্রস্থানে আমার বড় গান শুনিতে ইচ্ছা করিল। চন্দ্রাকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করিলাম। সে কয়েকবার আপত্তি করিয়া পরে স্বীকৃতা হইল। চন্দ্রার স্বর বড় মধুর, সে সেই মধুর স্বরে করুণকণ্ঠে গান গাহিতে লাগিল—

"সাচী-প্রীতি হাম্ তোমা সঙ্গ যোড়ি
তুম্ সঙ্গ যোড়ি আওর সঙ্গ তোড়ি।
যো তুম্ বাদল তো হাম মৌ'রা,
যো তুম্ চন্দ্র হাম ভায়জী চকোরা।

যো তুম্ দেওরা তো হাম্ বাতি,
যো তুম্ তীরথ তো হাম্ যাত্রী।
যাঁহা যাঁই তাঁহা তেরি হি সেবা,
তুম্ সা ঠাকুর আওর না দেবা।"

এই গানটি ভগবানের চরণে ভক্তের আত্মনিবেদন। ভক্ত বলিতেছে, ওগো তুমি আমার ইন্দু, আমি তোমার জ্যোৎস্নাভিখারী চকোর। এই প্রেমের পুণ্যতীর্থে এই নির্জ্জন উদ্যানের মাঝে প্রকৃতির মৌন সহানুভূতির মধ্যে সেই গানের রাগিণী আকাশে বাতাসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অন্তরের মণিকোঠায় থাকিয়া থাকিয়া বাজিতেছিল—"তুম্ সা ঠাকুর আওর না দেবা।"

(৩)

"সেদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে চন্দ্রার কয়েকটি ছোট ভাই বোনদের সঙ্গে লইয়া চন্দ্রা আর আমি প্রয়াগে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এলাহাবাদ ফোর্টের নিকট একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া আমরা গিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। ধীর সমীরণে শান্ত নদীর বুকের উপর দিয়া তর্‌তর্ বেগে নৌকাখানি চলিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যার অস্তমান রবির কিরণ যমুনার কালো জলে পড়িয়া একটা কোমল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ক্রমে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে আসিয়া পড়িলাম। সেখানে যমুনার স্বচ্ছ নির্ম্মল কালো জল গঙ্গার শুভ্র অঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। শরতের নির্ম্মেঘ আকাশের তরল জ্যোৎস্না গঙ্গার বুকে চিক চিক করিতেছে। মনে হইতেছিল যেন একটি গৌরবর্ণা তন্বী গুছাইয়া একখানি নীলাম্বরী শাড়ী পড়িয়াছে। এই যমুনার সাথে কত গাঁথা কত গীতিকাব্য কত বাঁশরীর রাগিণী মিশাইয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার সেই পরাণ পাগল-করা উদাস ভাবের মাঝে মনে হইতেছিল যেন কোন্ অদূর কুঞ্জভূমি হইতে শ্যামসুন্দরের গোপীমন-ভুলান বাঁশরীর ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিতেছে। চন্দ্রা সাথে করিয়া একটি সেতার লইয়া আসিয়াছিল। ভাবমুগ্ধ হইয়া সে কখন উহার কাণ মোচড়াইয়া পর্দ্দায় অঙ্গুলি সংযোগ করিয়া একটা মধুর ঝঙ্কার দিল। সুর প্রথমে মৃদু হইতে মৃদুতর হইলেও ক্রমে তাহা নব বধূর ঘোমটা ঢাকা মুখের মত সুস্পষ্ট হইতে লাগিল। সুরের শান্ত কোমল উচ্ছ্বাস

তরঙ্গের তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছিল। আমি ভাবের আবেগে সেই সুরের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে লাগিলাম—

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনি!
নির্ম্মল সূর্য্য করোজ্জ্বল ধরণী জনক-জননী-জননী।
প্রথম প্রভাত তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে
জ্ঞান-ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী।"

রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া চন্দ্রা গানটি শুনিতে ছিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। আমি আবেগ বিহ্বল কণ্ঠে গাহিয়া চলিলাম—

"নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণ তল
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র তুষার কিরীটিনী।"

গান থামিয়া গেল। অনেকক্ষণ সকলে নীরব হইয়া রহিল, তারপর চন্দ্রা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল —"কি সুন্দর কথাগুলি"! আমি বলিলাম এই সঙ্গীতটী আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথের রচনা। পদলালিত্যে ও ভাবমাধুর্য্যে এই গানটী বাঙ্গলা ভাষার এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। এই যে আমাদের দেশ জননীর পবিত্রশ্রীর পরিচয় যার স্মৃতি মাত্রেই আমাদের মনে এক অভূতপূর্ব্ব গর্ব্বের ভাব জাগিয়া উঠে, আম। কি তাহা ধারণ করিবার উপযুক্ত হইব না। কোন্ অপূর্ব্ব উষায় এই ভারতের তপোবনে সামঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছিল; কত জ্ঞানের বার্ত্তা ধর্ম্মের কথা এই আর্য্য ঋষিগণের আবাসভূমি হইতে প্রচারিত হইয়াছিল; নূতন সভ্যতার দীপ্তিতে প্রভাসিত কত কাব্য দর্শন পৌরাণিক কাহিনী এই তুষারমৌলি হিমাচলরক্ষিত শতপুণ্যনদনদীবিধৌত আর্য্যভূমি হইতে বিঘোষিত হইয়াছিল। আমরা সেই ভারতে জন্মিয়া সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী পরের কথায় বিমুগ্ধ, নিজের নিজস্ব বুঝিবার চেষ্টা করি না, আত্মপ্রতিষ্ঠায় আমাদের যত্ন নাই। এইরূপ দেশের অনেক কথা চন্দ্রার সাথে আমার সেদিন হইয়াছিল। রাত্রি হইয়া আসিল আমরা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

(৪)

"পরদিন দেশ হইতে সংবাদ আসিল আমার মায়ের বড় অসুখ, শীঘ্রই আমার যাওয়া প্রয়োজন। সে দিনই চন্দ্রাদিগের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। আজও মনে পড়ে চন্দ্রার সেই বিচ্ছেদকাতর মুখখানি যাহা আমার অন্তরের মাঝে মূর্ত্তি লইয়া এখনও জাগিয়া রহিয়াছে। দেশে আসিয়া দেখিলাম মায়ের আমার বড়ই অসুখ। প্রাণপণ যত্ন করিয়া যথাসাধ্য অর্থব্যয়ে মায়ের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চালাইতে লাগিলাম। প্রায় দশমাস ভুগিয়া আমার মায়া কাটাইয়া মা আমার স্বর্গে গমন করিলেন। মৃত্যু শয্যায় আমার মাথায় হাত রাখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"বাবা, জীবনে চিরসুখী হও।" ভগবান্ অন্তরালে থাকিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"হুঁ"।

প্রায় একবৎসর উদাস ভাবে তীর্থে তীর্থে কাটাইয়া মনটা একটু শান্ত হইলে দেশে ফিরিয়া আসিলাম। এতদিন মনের অশান্তি ও উৎকণ্ঠায় চন্দ্রার কথা বড় মনে আসে নাই, কিন্তু আজ বাড়ী আসিয়া শুধু চন্দ্রার কথাই মনে হইতে লাগিল। কয়েকদিন এইরূপভাবে মনমরা থাকিয়া এলাহাবাদে যাইব ভাবিতেছি এমন সময় আমার নামে একখানি পত্র আসিল। ডাক ঘরের ছাপ দেখিয়া বুঝিলাম চিঠিখানি এলাহাবাদ হইতে আসিতেছে। বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলিয়া ফেলিলাম। সংবাদ পড়িয়া মাথা ঘুড়িয়া গেল, হাত হইতে চিঠিটা পড়িয়া গেল। এলাহাবাদ হইতে চন্দ্রার মামাত বোন লিখিয়াছে "সুশীল বাবু, আমাদের প্রিয় ভগিনী চন্দ্রা আজ চারিদিন হইল আমাদের সকলের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রায় ছয়মাস কাল তিনি ক্ষয় রোগে ভুগিতে ছিলেন, মৃত্যুর একসপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি আপনার নামে একখানি পত্র লিখিয়া গিয়াছেন। আমাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন মৃত্যুর পরে ইহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিতে। সেই কথা অনুসারে পত্রখানি আপনার কাছে পাঠাইলাম।" স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর ধীরে ধীরে চন্দ্রার পত্রখানি তুলিয়া লইলাম। চন্দ্রা লিখিয়াছে—

"ওগো বন্ধু আমার,

মনে হয় আজ কত যুগ বুঝি কেটে গেছে আমাদের সেই—চিরমধুর মিলনের পরে। না, তর্ক করোনা, জানি তোমার তর্ক করবার একটা রোগ

আছে। তুমি বোধ হয় বুঝবে না সত্যি সত্যি একটা যেন যুগ কেটে গেছে। যাকে সামনে পেলে নিমেষে হারাই এমনতর ভয় সব সময়ে জেগে থাকৃত তাকে এতদিন না দেখে কেমন করে বেঁচে আছি আমিই বুঝতে পারিনি। মনে পড়ে কি তোমার কাছেই একদিন বিদ্যাপতির একটা পদ শুনেছিলাম, সেটা আমার খুব ভাল লেগেছিল—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়াপর রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

আজ বুঝতে পারছি এ মস্ত একটা সত্যি কথা। হেসোনা, মনে ভাব্‌ছ চন্দ্রা কেমন করে এতবড় দার্শনিক হয়ে পড়ল। দার্শনিক কি লোকে কেবল বই পড়েই হবে, মনের মাঝখানে কতভাব কত নূতন রূপ নিয়ে ফুটে উঠ্‌ছে। সেই সব রূপকে চিন্‌তে গেলেই ত মানুষ দার্শনিক হয়ে পড়ে। এত-দিনের জমাট বাঁধা ব্যথা আজ আমায় এমন মুখরা করে দিয়েছে। তুমি ভাব্‌ছ এতদিন তবে কেমন করে তোমায় ভুলে ছিলাম। বন্ধু, ভুলতে তোমায় কখন পারিনি, পার্‌তেও চাইনি। কতদিন তোমায় চিঠি লিখতে বসেছি কিন্তু দুই ছত্র লিখেই লজ্জায় আর লিখ্‌তে পারি নি। দুছত্র লেখা চিঠিখানা অমনি ছিঁড়ে ফেলেছি। আজ আমার কিন্তু লজ্জার সকল বাঁধন টুটে গিয়েছে। জানি আমি আমার দিন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে আর তুমি যখন আমার এচিঠি পাবে তখন আমি অন্য লোকে। লজ্জায় আর আমার মৌন রাখতে পারবে না কারণ আজ আমি তোমার কাছে আমার প্রাণের কথা উজাড় করে দিয়ে যাব।

মনে পড়ে তোমার সেই ডিরি অনসনে থাকার কথা? তোমার সুন্দর সরল তেজস্বী কথাগুলি শুন্‌তে শুন্‌তে আমি তোমার মুখের পানে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে থাকৃতাম। কি দীপ্ত সে মুখ কি স্বর্গীয় লাবণ্য সে মুখে খেলা করৃত। তুমি স্বভাবতঃ বড় বেশী কথা বলতে না কিন্তু তোমার কথাগুলি শুন্‌তে আমার এমন ইচ্ছা হ'ত যে কোন বিষয়ে তোমার বিরুদ্ধ মত বলে তোমার অনর্গল তর্কের ঝরণায় ডুবে থাকৃতাম। তুমি বুঝি ভাব্‌তে আমি তোমার কথাগুলি সব গিলে নিচ্ছি তোমার ভক্ত শিষ্য হব বলে। তোমার কথাগুলি গিলতাম নিশ্চয় কিন্তু সে যেমন দেবতারা সাগর মন্থনের পর অসুরের ভয়ে সুধা গিলেছিল। ভয় হত পাছে একটা কথাও হারিয়ে ফেলি। তারপর

যেদিন তুমি ডিব্রি অনসোন থেকে এলাহাবাদে চলে গেলে তখন আমার বুক ভেঙ্গে যেন কান্না বেরচ্ছিল। জান্‌তাম আমরা ও শীঘ্রই এলাহাবাদে যাচ্ছি, তবু বিচ্ছেদটা আমার প্রাণে এমনি ভাবে বেজেছিল।

তারপর কৃষ্ণা হোটেলের ম্যানেজার যেদিন বাবার কাছে তার করলে আর আমরা তোমার ওখানে গিয়ে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখলাম, সে দিন আমার মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জাগল আমি তোমায় সারিয়ে তুলবই। বন্ধু আজ আমার কোন ও সঙ্কোচ নেই, তাই তোমায় সব কথাই বল্‌তে পার্‌ছি। তোমার অসুখের মধ্যে তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখে চিকিৎসকের আশা পেয়ে বা নিরাশ ভাব দেখে কখনও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তাম কখনও বা অবসাদে হৃদয় ভেঙ্গে পড়ত। কিন্তু ভগবানের নাম নিয়ে দিনরাত্রি বুক বেঁধে শুশ্রূষা করেছিলাম। ওঃ, সে দিন তোমার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে আমার কি আনন্দই হয়েছিল।

সেদিন শরতের আকাশে জ্যোৎস্নার বাণ ডেকেছিল। খোলা জানালা দিয়ে তোমার মুখের উপর আলোর ধারা খেলা করছিল। আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। তখন মহেন্দ্রযোগ না ঐ রকম একটা শুভলগ্ন; তুমি অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছিলে। আমি আমার আঙটিটা তোমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলাম, তোমার আঙটিটা খুলে নিয়ে নিজের আঙ্গুলে পরে নিলাম। তারপর তোমার পায়ের কাছে ঢিপ করে একটা নমস্কার করে ফেললাম। ঈশ্বরকে সাক্ষী করে বল্‌লাম এই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। তুমি হাস্‌ছ। কিন্তু জেনো ভগবান যেখানে পুরোহিত এবং আকাশের তারা যেখানে সাক্ষী তার চেয়ে খাঁটি বিয়ে আর হতে পারে না। প্রকৃত বিয়ে ত অন্তরে অন্তরে মিলন, জাত সম্বন্ধ বিচার করলে তার গৌরবটাকেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। মন্ত্রপড়া ত একটা লৌকিক আচার মাত্র। যখন মনে মনে বিয়ে হয়ে গেল তখন কোন মন্ত্রটা পড়া হল কি না হল তা ভাববারই ত সময় থাকে না। প্রকৃতির মাঝেও ঠিক এমনি প্রেমের লীলা, দেখনি মাধবীলতা যখন সহকারতরুকে ঘিরে ঘিরে পরিপূর্ণ প্রাণ নিয়ে গড়ে উঠে, তখন সে ভেবে দেখে না তার প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ কোনও লৌকিক নিয়মসিদ্ধ বা মন্ত্রানুমোদিত কি না।

তারপর তুমি তোমার মায়ের অসুখ শুনে চলে গেলে। পাছে তোমার যাত্রায় অশুভ হয় এই জন্য প্রাণপণে তোমার নিকট প্রফুল্লভাব দেখিয়ে এসেছি। কিন্তু যেমন বেশী আঘাত লাগলে একটা নীল কালশিরে দাগ হয়ে থাকে,

রক্তের লেশও পড়েনা, তেমনি এই আমার জমাটবাঁধা বেদনা এমনি পুঞ্জীভূত হয়েছিল, যে তাতে বোধ হয় অশ্রুর উৎসের মুখে একটা পাথর চাপা পড়েছিল।

তোমার কি মনে পড়ে তোমার একখানি ফটো এলাহাবাদে চুরি গিয়েছিল। সে চোর আমিই। তোমার চলে আসার পর সেই ফটোখানি রোজ গোলাপ ফুলে সাজিয়ে রাখ্‌তুম কারণ জান্‌তাম তুমি গোলাপ ফুলই বেশী ভালবাস্‌তে। এখনো এই যে আমি তোমার কাছে চিঠিখানি লিখ্‌ছি তাতেও আমার সামনে তোমার ফটোখানি যেন একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধু, আর আমি কি বল্‌ব, আমার কথা শেষ হয়ে এসেছে। বন্ধু, চল্‌লাম, বিবাহ ত আমাদের হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষায় রইলাম, জন্ম জন্মান্তর ধরে তোমার অপেক্ষায় থাকব। সাধনায় সিদ্ধি হবেই, তোমাকে আমি নিশ্চয়ই পাব এই আশা দিয়ে বুক বেঁধে থাক্‌ব। বন্ধু, চল্‌লাম মিলনের পথ চেয়ে বসে থাক্‌ব। বিদায়, বন্ধু, বিদায়। চন্দ্রা।"

এইখানে সুশীলচন্দ্র তাহার জীবনের আখ্যায়িকা শেষ করিয়া বলিলেন—"ওগো, আজ তোমরা আমার জীবনের কথা শুন্‌লে। জীবনে আমার সুখের উৎস—শুখিয়ে গিয়েছে। যার সাথে আমার এমনি পবিত্র মিলন হয়েছে তার সাথে আবার কবে মিল্‌ব তাই বসে বসে ভাবি। সেই মিলনেই হবে আমাদের ফুলশয্যা।" এই বলিয়া সুশীলচন্দ্র নীরব হইলেন। তখন রাত্রি অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। চিন্তান্বিত মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। পথে কে যেন তখন গাহিরা যাইতেছিল—

"মন-বুলবুলে তুলেছে রাগিণী
হৃদয় আমার মথিছে ধীরে ;
গত জীবনের কত ভালবাসা
অবুঝ মানসে বিহরি ফিরে।"

নারায়ণের নিকষ-মণি

বেহার-চিত্র—শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত প্রণীত। রায় চৌধুরী কোম্পানী কর্ত্তৃক ৬৮।৫ রসারোড নর্থ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১।০।

গ্রন্থকার কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—বেহারীচরিত্রের অসম্পূর্ণতাই

উহাদের উপকরণ। কিন্তু গ্রন্থকার বেহারীর যে সকল অসম্পূর্ণতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সকল প্রদেশীর চরিত্রে বর্ত্তমান আছে। জানিনা ভারতের কোন প্রদেশে "মেহেরবান্‌খাঁ" ও "হরসুখরায়" প্রভৃতির ন্যায় "জো হুজুর" লোকের অভাব আছে।

চিত্রগুলি বেশ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে—হাস্যরসে আবরিত হইয়াছে বলিয়া চিনি মণ্ডিত কুইনাইনের কার্য্য করিয়াছে। এক্ষণে ব্যাধি সারিলেই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথম দুইটি চিত্রে বেহারীচরিত্রের দুর্ব্বলতা দেখাইতে গিয়া ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, লেখকমহাশয় ভারতশাসনের গুপ্ত রহস্য উৎঘাটন করিয়া ফেলিয়াছেন—যিনি ইমান্ খোয়াইয়া দেশবাসীর সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন, তিনিই কর্ত্তাদের চক্ষে "ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং চিরস্থায়ী করিবার জন্য যে প্রকার লোকের আবশ্যক তাহাদের আদর্শ হইবার উপযুক্ত" যাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রতি-মুহূর্ত্তের প্রবঞ্চনার নব নব উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত তিনিই সেলামের জোরে "রায় সাহেব" খেতাবে ভূষিত: আর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াই বলা হইতেছে, "আপনার দেশ প্রসিদ্ধ সাধুতা, বদান্যতা ও প্রজাপ্রিয়তায় গভর্ণমেণ্ট মুগ্ধ"। উহাদের মধ্যে কতটা সত্য লুকান আছে গ্রন্থকারই জানেন।

কেবল বেহারবাসীর "অন্ধকার অংশ" আঁকা হইয়াছে এই অনুযোগের উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে তিনি বন্ধুভাবেই এই রূপ করিয়াছেন কেননা—এই সকল অসম্পূর্ণতা পরিহার করিয়া তাঁহারা কল্যাণলাভ করুন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা—কথা সত্য হইতে পারে কিন্তু আমাদের এই স্থানে বক্তব্য যে পুস্তকখানি অতি অল্পবেহারীই পড়িবে। সুতরাং কেবল dark side আঁকিয়া চিত্র অসম্পূর্ণ রাখিয়া লাভ কি ?

লেনিন—শ্রীফণিভূষণ ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা, কলেজষ্ট্রীট, মার্কেট, ইণ্ডিয়ানবুক্‌ক্লাব হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০। বোলসেভিক্‌নেতা লেনিনের ক্ষুদ্রজীবনী। বইখানি ছোটর উপর বেশ শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা]　　　　[পৌষ, ১৩২৮।

স্বরাজ্য-সাধনা

[শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী]

সদা স্বরূপসম্প্রাপ্তঃ স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি।—শ্রীশ্রীমদ্ ভাগবত।

যুগান্তর পরে আজি　　　বিজয়-দুন্দুভি বাজি'
রোমাঞ্চ সঞ্চারে এহি বঙ্গের শ্মশানে।
জাগিল রে সুপ্ত জাতি　　　জলন্ত উৎসাহে মাতি,'
উদ্যমে, আশায় দীপ্ত, উদ্বুদ্ধ পরাণে।
সর্ব্ব ভেদাভেদ ভুলি'　　　ভায়ে ভায়ে কোলাকুলি ;
উচ্চ-নীচ নাহি আর ;—প্রেমে একাকার!
চৈতন্যচন্দ্রের বঙ্গে　　　প্রমত্ত তরঙ্গ ভঙ্গে
দিব্য চৈতন্যের বন্যা বহিল আবার!
উত্তাল তটিনী ধায়,　　　দ্বেষ-হিংসা ভেসে যায়,
ধন্য সবে তাহে এবে করি' শুচিস্নান।
কত জন্ম জন্ম পরে　　　আজিরে বিধির বরে
স্বার্থ পরার্থেরে করে বরমাল্য দান!

*　　　*　　　*

একতা-পতাকা মূলে　　　মিলি' সবে, কণ্ঠ খুলে'
গাহ,—"জয় জগদীশ শঙ্কাভয়হারী!

এযে তব কৃপাবরে জীবন্ত হইল জড়ে!
জয় হে অনন্যগতি, অকূলকাণ্ডারী।"
মুখে কর নাম গান, সবে হও একপ্রাণ,
সমবেত শক্তি দেহ স্বদেশ-সেবায়।
কহ দৃঢ় সমস্বরে স্মরি' শিব-বিশ্বেশ্বরে,—
"এ বিশ্বে আমরা আর র'ব না ঘুমায়ে"!
ঊর্দ্ধে তুলি' দুই হাত কর তাঁরে প্রণিপাত,
তাঁরে সাক্ষী রাখি' কহ,—"অটল এ পণ,—
স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা করি' স্বরাজ্য লইতে বরি'
বধিব আত্মার অরি উপেক্ষি, জীবন।
কে আর নিদ্রিত রবে? অমৃতের পুত্র সবে;—
তোমারি চিদংশ-কণা মোরা দীপ্যমান!
তুমি যে র'য়েছ চুপে এই দেহে আত্মারূপে;
মোদের লাঞ্ছনা, সে যে তব অসম্মান!
ওগো পিতা, হে বিধাতা, পরমাত্মা, পরিত্রাতা,
মোদের সর্ব্বস্ব-ধন, হে অনন্যগতি,
তুচ্ছ করি' ক্ষুদ্র প্রাণ তোমার এ অপমান
মোচন করিব প্রভু,—দেহ সে শকতি!
সাক্ষী সূর্য্য-শশি-তারা —জাগ্রত অম্বরে যাঁরা!
সাক্ষী অন্তর্য্যামী তুমি দেব-নারায়ণ!
দিলাম রক্ষিতে পণ সর্ব্ব স্বার্থ বিসর্জ্জন।
—মন্ত্রের সাধন কিম্বা দেহের পতন!"

* * *

স্নেহ-মায়া স্বরূপিণী, বেদ বিদ্যা প্রসবিনী,
মোক্ষধাম এ ভারত-জননী মোদের
অনাদি স্মৃতির খনি, পুণ্যময়ী চিন্তামণি,
জুড়াতে আশ্রয়-ঠাঁই ইহজীবনের।
সর্ব্ব বাধা-বিঘ্ন অরি আত্মবলে জয় করি,
সে জন্মভূমির প্রেমে ভুলি' আত্ম-পর,

দিব্য মন্ত্রে দীক্ষা লভি' বাহিতো মায়ের ছবি
স্মরি মনে মহাশৌর্য্যে হও অগ্রসর।
হাসি-খেলা নহে ইহা বিলাস-বাসনা নিয়া!
এ যে পুণ্য প্রেমানলে আত্ম-বিলোপন!
মধু পানে মাতোয়ারা অমৃত-সন্তান যারা,
এ শুধু তাঁদেরি তরে দীপ্ত আয়োজন!

* * *

কে আছ সঁপিবে প্রাণ? এস, হও আগুয়ান।
অভয় আহ্বান ওই আসে বারংবার,—
"স্বধর্ম্ম-স্বরাজ্য তরে যে জীবন দান করে
সে যে নিত্যধামবাসী,—কিবা শঙ্কা তার।"
জাগো তবে! হে বিশ্বাসি, মোছ' আত্ম-গ্লানি রাশি,
মত্ত হও ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে শিব-শক্তি বলে।
সর্ব্ব দুঃখ দূর করে' স্থাপ' তাঁরে শিরোপরে,
প্রক্ষাল' সে পাদপদ্ম ভক্তি নেত্রজলে!

———

শিক্ষার বিরোধ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

আমার এ সব কথার কথা নয়,—উদ্দীপনাপূর্ণ স্বদেশী লেকচার নয়,—সত্য সত্যই যা আমি সত্য বলে বুঝেছি তাই কেবল আপনাদের কাছে বলছি। মানুষের এক প্রকার শিক্ষা আছে যা' কেবল নিছক ব্যক্তিগত সুখ ও সুবিধার খাতিরে মানুষে অর্জ্জন করিতে চায়। যে mentality থেকে আমাদের এদেশে কেউ কেউ ইংরিজি ভাষাটা সাহেবের গলায় বলাটাকেই চরম উন্নতি জ্ঞান করে এবং এই mentalityরই এক ধাপ নীচের লোকগুলো জাহাজে এবং

রেলগাড়ীতে সাহেবি পোষাক ছাড়া কিছুতেই বেড়াতে চায় না। এবং এই জিনিষটা এত ইতর, এত ক্ষুদ্র, যে এ কেন হয়, এর কি উদ্দেশ্য এ বিষয় আলোচনা করিতেও ঘৃণা বোধ হয়, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই ছদ্মবেশের হীনতা, এই আপনার কাছ থেকে আপনাকে লুকোবার পাপ, এবং গভীর লাঞ্ছনা আপনারা অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে এ কথা কেন যে উত্থাপিত করলাম তাও বুঝতে আপনাদের বাকী থাকবে না।

এইখানে জাপানের কথা স্মরণ করে কেউ কেউ বলতে পারেন, এই যদি সত্য, তবে জাপান আজ এমন হলো কিসের জোরে? তার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের কার ইতিহাসটা একবার ভেবে দেখ! ভেবে আমি দেখছি। পশ্চিমে শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্বের জোরেই যদি সে আজ বড় হয়ে থাকে তবে বড়ত্বটাও মেপে দেখেছি আমরা শুক্রচার্য্যেরই মাপ কাঠি দিয়ে। কিন্তু মানবত্ব বিকাশের সেই কি শেষ মান-দণ্ড? জাতীয় জীবনে এই দু'শো পাঁচশো বছরের ঘটনাই কি তার চরম ইতিহাস?

আমি জাপানের ইতিহাস জানিনে। তার কি ছিল এবং কি হয়েছে এ বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, কিন্তু এই তার পার্থিব উন্নতির মূলে, পশ্চিমের সভ্যতার পদতলে যদি তার আত্ম সমর্পণের সূচনাই করে থাকে, ত তারস্বরে আনন্দধ্বনি করবার বোধ হয় বেশী কারণ নেই। এবং এম্‌নি দুর্দ্দিন যদি কখনো ভারতের ভাগ্যে ঘটে,—সে তার বিগত জীবনের সমস্ত tradition বিস্মৃত হয়ে ঠিক অতখানি উন্নত হয়েই ওঠে, এক কালো চামড়া ছাড়া পশ্চিমের সঙ্গে তার কোন প্রভেদই না থাকে, ত ভারতের ভাগ্য-বিধাতা অন্তরীক্ষে বসে সে দিন হাসবেন কি নিজের চুল ছিঁড়বেন বলা কঠিন।

কোন বড় জিনিসই কখনো নিজের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে হয় না। হবার যোই নেই। তাদের যে বিদ্যাটার প্রতি আমাদের এত লোভ তা' তাদের মাথায় হাত বুলিয়েই শিখে নিই, বা পায়ে তেল মাখিয়েই অর্জ্জন করি,—এর ফল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী যদি না সে দেশের প্রতিভার ভিতর থেকে সৃষ্ট হয়ে ওঠে। এর মূল যদি না জাতির অতীতের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করে এসে থাকে। এই ফুল-সমেত বৃক্ষ শাখা তা সে বর্ণে ও গন্ধে যত দামীই হোক্ একদিন শুখাবেই শুখাবে, কোন কৌশলই তাঁকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবে না।

এই সত্যটা আজ আমাদের একান্তই বোঝবার দিন এসেচে যে, ঠকিয়ে-

মজিয়েই হোক্ বা কেড়ে-বিকৃড়েই হোক্ নানাদেশ থেকে টেনে এনে জমা করাটাই দেশের সম্পদ নয়। যথার্থ সম্পদ দেশের প্রয়োজনের মধ্যে থেকেই গড়ে ওঠে। তার অতিরিক্ত যা সে শুধুই ভার, নিছক আবর্জ্জনা। পরের দেখে আমরাও যেন ওই ঐশ্বর্য্যের প্রতি লুব্ধ হয়ে না উঠি। আমাদের জ্ঞান, আমাদের অতীত আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিল, আজ অপরের শিক্ষার মোহে যদি নিজের শিক্ষাকে হেয় মনে করে থাকি ত সে পরম দুর্ভাগ্য। ঐ যে ট্রাম, ঐ যে মোটর পথের উপর দিয়ে বায়ুবেগে ছুটেচে ; ঐ যে ঘরে ঘরে electric পাখা ঘুরচে, ঐ যে সহরের আলোর মালার আদি অন্ত নেই,—ঐ যে শত সহস্র বিদেশী সভ্যতার তোড়-জোড় বিদেশ থেকে বয়ে এনে জমা করেচি, ওর কোনটাই কি আমাদের যথার্থ সম্পদ? বিগত যুদ্ধের দিনের মত আবার যদি কোন দিন ওর আমদানির মূল শুকিয়ে যায় ত ভোজবাজির মত ওদের অস্তিত্ব এ দেশ থেকে উঠে যেতে বিলম্ব হবে না। ওসকল আমরা সৃষ্টি করিনি, করতেও জানিনে। পরের কাছ থেকে বয়ে আনা আজ ও-সকল আমাদের না হলেও নয়, অথচ, ওর কোনটাই আমাদের যথার্থ প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠেনি। এই যে দেখা দেখি প্রয়োজন, এ যদি আমরা গড়তেও না পরি ছাড়তেও না পারি, তা হলে দুষ্ট ক্ষুধার মত ও-কেবল আমাদের একদিকে প্রলুব্ধ এবং অন্যদিকে পীড়িতই করতে থাকবে। কিন্তু পশ্চিম-ওদের সৃষ্টি করেচে নিজের গরজ থেকে। তাদের সভ্যতায় ও-সকল চাইই-চাই। ওই যে বড় বড় মানোয়ারী জাহাজ, ওই যে গোলা-গুলি-কামান-বন্দুক-গ্যাসের নল, ওই যে উড়ো এবং ডুবো জাহাজ ও সমস্তই ওদের সভ্যতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাই কোনটাই ওদের বোঝা নয়, তাই ওদের পরিণতি, ওদের নিত্য-নব আবির্ভাব দেশের প্রতিভার ভিতর থেকেই বিকশিত হয়ে উঠ্ছে। দূর থেকে আমরা লোভ করতেও পারি, নিতান্ত নিরীহ গোছের বাবুয়ানীর সরঞ্জাম কিনেও আনতে পারি কিন্তু বাণিজ্য জাহাজই বল, আর মোটর গাড়ীই বল, যতক্ষণ না সে নিজেদের প্রয়োজনে নিজের দেশে, নিজের জিনিষের মধ্য দিয়ে জন্ম লাভ করে ততক্ষণ যেমন্ করে এবং যত টাকা দিয়েই না তাদের সংগ্রহ করে আনি সে আমার সত্যকারের ঐশ্বর্য্য নয়। তাই ম্যান্চেষ্টারের সূক্ষ্ম বস্ত্র, গ্লাসগো লিনেন এবং মসলিন, স্কটল্যাণ্ডের পশমের শীত বস্ত্র,—তা সে আমাদের যত শীতই নিবারণ করুক, এবং দেহের সৌন্দর্য্য যতই বৃদ্ধি করুক কোনটাই আমাদের যথার্থ সম্পদ নয়—নিছক আবর্জ্জনা।

কিন্তু আমি একটু সরে গেছি। আমি বলছিলাম যে সে মানুষ কেবল সত্যকারের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করতে পারে এবং সৃষ্টি করা ছাড়া সে কখনো সত্যকারের সম্পদ ও পায় না। কিন্তু পরের কাছে শিখে মানুষে বড় জোর সেই টুকুই তৈরি করতে পারে, কিন্তু তার বেশী নয়—সে সৃষ্টি করতে পারে না। অথচ, সৃষ্টি করাটা শক্তি, সেটা শেখা যায় না,—এমনি কি পশ্চিমের দ্বারস্থ হয়েও না। এই শক্তির আধার নিজের প্রতি বিশ্বাস,—আত্মনির্ভরতা। কিন্তু যে শিক্ষা আমাদের আত্মস্থ হতে দেয় না, অতীতের গৌরব কাহিনী মুছে দিয়ে আত্ম-সম্মানে অবিশ্রাম আঘাত করে; কাণের কাছে কেবলি শোনাতে থাকে আমাদের পিতা পিতামহেরা কেবল ভূতের ওঝা আর মন্ত্র-তন্ত্র দৈবজ্ঞ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের কার্য্য কারণের সম্বন্ধ জ্ঞান বা বিশ্বজগতের অব্যাহত নিয়মের ধারণাও ছিল না—তাই আমাদের এদুর্দ্দশা—তা হলে সে শিক্ষার যত মজাই থাক্, তার সঙ্গে অবাধ কোলাকুলি একটু দেখে শুনে করাই ভাল।

পশ্চিমের সভ্যতার আদর্শে মানুষ-মারবার শত কোটী যন্ত্র-তন্ত্র, পরের দেশও তার মুখের গ্রাস অপহরণ করবার ততোধিক কলকারখানা, এ সমস্তই তার প্রয়োজনে তার নিজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচে,—কিন্তু ঠিক ওই সকল আর একদেশের সভ্যতার আদর্শে প্রয়োজন কিনা আমি জানি না। কিন্তু কবি বলেছেন এই সকল মহৎ কার্য্য করেছে তারা নিশ্চয়ই কোন একটা সত্যের জোরে। অতএব ওটা আমাদের শেখা চাই, কারণ বিদ্যাটা তাদের সত্য। এবং পরক্ষণেই বলেছেন, কিন্তু শুধু ত বিদ্যা নয়, বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানীও আছে, সুতরাং শয়তানীর যোগেই ওদের মরণ।

হতে ও পারে। কিন্তু যে লোক মারণ-উচাটন বিদ্যে শিখে মন্ত্র জপ্‌তে সুরু করেচে, তার কোনটা সত্য আর কোনটা শয়তানী নির্ণয় করা কিছু কঠিন।

কবি আমাদের মুখে একটা কথা গুঁজে দিয়ে বলেছেন, "ঐ কথাটাই ত আমরা বারবার বল্‌চি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের (অর্থাৎ পশ্চিমের) এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে পাকিয়ে এক-এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এত বড় হাঁ করচে তাদের সঙ্গে আমাদের কোন কারবার চল্‌তে পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে আমরা বিদ্যাকে, এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা বিষের মত পরিহার করা চাই।"

এমন কথা যদি কেউ বলেও থাকে ত খুব বেশী অন্যায় করেছে আমার মনে হয় না। Physics, Chemistry হিন্দু কি ম্লেচ্ছ একথা কেউ বলে না। বিদ্যার জাত নেই এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে Culture জিনিষটারও জাত নেই এ কথা কিছুতেই সত্য নয়। এবং ওদের শিক্ষা যদি কেউ বিষের মত পরিহারের ব্যবস্থাই দিয়ে থাকে ত সে কেবল এই জন্যেই, বিদ্যার জন্যে নয়। আর এই যদি ঠিক হয় যে তারা কেবল অবিদ্যাকেই মানে এবং আমরা মানি বিদ্যাকে, তা হ'লে এ দুটোর সমন্বয়ের উপায় বইয়ের মধ্যে প্রবন্ধের মধ্যে শ্লোক তুলে তুলে হতেও পারে, কিন্তু একটাকে আর একটার গিলে না খেয়ে বাস্তব জগতে যে কি ভাবে সমন্বয় হতে পারে আমি জানিনে। যাদের গেলবার মত বড়-হাঁ আছে তারা গিল্‌বেই—মনু বা উপনিষদের দোহাই মান্‌বে না। অন্ততঃ এতকাল যে মানেনি সে ঠিক।

পশ্চিমের ত বড় লঙ্কাকাণ্ডের পরেও যে আজ সেই ল্যাজটার ওপরে মোড়কে মোড়কে সন্ধি-পত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো চল্‌চে, এবং এত মারের পরেও যে তার নাড়ী বেশ তাজা আছে তাতে আশ্চর্য্য হবার আছে কি? এই মহাযুদ্ধ যারা যথার্থ বাধিয়েছিল তাদের দুপক্ষই চমৎকার সুস্থ দেহে ও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। যারা মরবার তারা মরেছে। এবং ফের যদি আবশ্যক হয় তাদেরই আবার মরবার জন্যে জড়ো করা হবে!

সুতরাং এদের মধ্যে আজ যদি কেউ শোকাকুল চিত্তে কবিকে প্রশ্ন করে থাকে, ভারতের বাণী কই? তাহলে সন্দেহ হয় তারা কিঞ্চিৎ রসিকতা করেছে মাত্র! এবং এই জন্যেই তাদের নিমন্ত্রণ করে ঘরে ডেকে এনে নিভৃতে "মা গৃধঃ" মন্ত্র দিয়ে বশ করা যাবে,—এ ভরসা আমার নেই। কারণ বাঘের কানে 'বিষ্ণু' মন্ত্র ফুঁকলে বৈষ্ণব হয় কিনা আমি কোনমতেই ভেবে পাচ্চিনে।

আরও একটা কথা। পশ্চিমের সভ্যতার একটা মস্ত মূল মন্ত্র হচ্ছে Standard of living বড় করা। আমাদের দেশের মূল নীতির সঙ্গে এর পার্থক্য আলোচনা করবার স্থান আমার নেই, কিন্তু ওদের সমাজ নীতির যেমন interpretationই দেওয়া যাক্, তার আসল কথা হচ্চে ধনী হওয়া। ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের সভ্যতা, ওদের ধনবিজ্ঞান,—এর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয় আছে, এ সত্য সে অস্বীকার করবে না। এই ধনী হওয়ার অর্থও কেবল ধন সংগ্রহ করাই নয়; সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেমনি

ধনহীন কোরে তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য। নইলে ধনী হওয়ার কোন মানেই থাকে না। সুতরাং কোন একটা সমস্ত মহাদেশ যদি কেবল ধনী হতেই চায় ত অন্যান্য দেশ গুলোকে সে ঠিক সেই পরিমাণে দরিদ্র না করে পারেই না। তবু এই একটা কথা নিত্য নিয়ত মনে রাখ্‌লে অনেক দুরূহ সমস্যার আপনি মীমাংসা হয়ে যায়। এই তার মেদ-মজ্জাগত সংস্কার, এই তার সমস্ত সভ্যতার ভিত্তি, এর পরে তার সমস্ত সাধনা নিয়োজিত। আজ আমার কথায় আমাদের ঋষি বাক্যে সেকি তার সমস্ত civilizationর কেন্দ্র নড়িয়ে দেবে? আমাদের সংসর্গে তার বহুযুগ কেটে গেল, কিন্তু আমাদের সভ্যতার আঁচটুকু পর্য্যন্ত সে কখনো তার গায়ে লাগ্‌তে দেয়নি। আপনাকে এম্‌নি সতর্ক, এম্‌নি শুচি করে রেখেচে যে কোন দিন এর ছায়া টুকু পর্য্যন্ত মাড়ায়নি। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এ দেশের রাজার মাথার কহিনূর থেকে পাতালের তলে কয়লা পর্য্যন্ত যেখানে যা' কিছু আছে কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায়নি। এটা বোঝা যায়, কারণ, এই তার সত্য, এই তার সভ্যতার মূল শিকড়। এই দিয়েই সে তার সমাজ দেহের সমস্ত সভ্যতার রস শোষণ করে, কিন্তু আজ খামকা যদি সে ভারতের আধিভৌতিক সত্য বস্তুর বদলে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পদার্থের enquiry করে থাকেত আনন্দ কোরব কি হুঁসিয়ার হব—চিন্তার কথা।

য়ুরোপ ও ভারতের শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে,—এই মূলে। আমাদের ঋষি বাক্য যত ভালই হোক্ তারা নেবেনা, কারণ, তাদের প্রয়োজন নেই। সে তাদের সভ্যতার বিরোধী। আর তাদের শিক্ষা তারা দেবেনা—কথাটা শুন্‌তে খারাপ কিন্তু সত্য। আর দিলেও তার যেটুকু ভিক্ষা সে টুকু না নেওয়াই ভাল। বাকি টুকু যদি আমাদের সভ্যতার অনুকূল না হয়, সে শুধু ব্যর্থ নয়, আবর্জ্জনা। তাদের মত পরকে মারতে যদি না চাই, পরের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়াটাই যদি সভ্যতার শেষ না মনে করি, তা মারণ-মন্ত্র যত সত্যই হোক্ তার প্রতি নির্লোভ হওয়াই ভাল।

আর একটা কথা বলেই আমি এবার এ প্রবন্ধ শেষ করব। সময়ের অভাবে অনেক বিষয়ই বলা হল না, কিন্তু এই অবান্তর কথাটা না বলেও থাকৃতে পারলাম না যে, বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়; শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী—এ দুটো আলাদা জিনিষ। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জ্জন করা নয়। এমনও হতে পারে বিদ্যালয় ছাড়াই বিদ্যালাভের

বড় পথ। আপাতঃ দৃষ্টিতে কথাটা উল্টো মনে হলেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। তেলে জলে মেশেনা, এ দুটো পদার্থও একবারে উল্টো, তবু, তেলের সেজ জ্বালাতে যে মানুষ জল ঢালে সে কেবল তেলটাকেই নিঃশেষে পুড়িয়ে নিতে। যারা এ তত্ত্ব জানে না তাদের একটু ধৈর্য্য থাকা ভাল, অমন উতলা হয়ে নিন্দে করতে নেই।

মৃণ্ময়ী

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

(১)

ডিনারের পর ড্রইং রুমে বসিয়া মিঃ মুখার্জ্জির বাড়ীতে নানারকম গল্পগুজব চলিতেছে। ইউজেনিস্‌ক হইতে আরম্ভ করিয়া হেগেলের dialectic পর্য্যন্ত আলোচনা চলিতেছিল। বিলাত না গেলে যে মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য হয় না সমস্ত আলোচনার পর সকলেই একবাক্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ শ্বেতেন বাবু। ভদ্রলোক এদেশের ইউনিভার্সিটির এম, এ, হইলেও কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান তাঁহার ছিল না। আর তিনি যত বড়ই বিদ্বান হোন না কেন—সেদিন সবার সামনে এমন একটা accent ভুল উচ্চারণ করিলেন যে না হাসিয়া কেহই থাকিতে পারে নাই। তারপর শ্বেতেন বাবুর স্থানাস্থান জ্ঞান নাই, একদিন পাখানি একবারে ন্যাংটা ক'রে বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের partyতে এসে হাজির—আমরা তো লজ্জায় :মরে গেলাম। আমাদের অন্যান্য —young lady friends কি মনে করলেন জানি না—তবে আমাদের সঙ্গে যেন পরিচয়ই নাই এইরূপ ভাব দেখিয়ে কোন রকমে সে দিন মান রক্ষা করি।

(২)

পর দিন সকাল বেলা ৯টার সময় সকলে চায়ের টেবিলে বসিয়াছেন। আজ এত কাজ—মিস্‌ মুখার্জ্জির Engagement ceremony—তাই সকলেই একটু সকালে উঠিয়াছেন। ছেলেটি বিলাতে পড়িত। দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়। আর যখন বিলাতের পাশ, তখন বিশেষ দেখিবারই বা কি আছে। মুখার্জ্জি সাহেবের নগদ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা —একমাত্র কন্যা। এই

সংবাদ পাইয়াই বিলেতী নারীর প্রতি প্রেম হঠাৎ স্বদেশ অভিমুখী হইয়া মিঃ বানার্জ্জিকে এখানে আনিয়াছে। আচার্য্য আসিয়া প্রার্থনা করিয়া গেলেন —নবীন প্রেমিকযুগলের মঙ্গলকামনা করা হইল। অঙ্গুরীয় দানও হইয়া গেল!

(৩)

আজ বিজয়াদশমী। মিঃ বানার্জ্জি মিস্ মুখার্জ্জির সহিত রাত দশটার সময় ড্রাইভের পর বাড়ী ফিরিলেন। ঋতেন বসিয়াছিল। মিস্ মুখার্জ্জি ঋতেনকে নমস্কার করিয়া একটা শিকার পাওয়া গিয়াছে, খানিকটা সময় আমোদে কাটানো যাইবে—মনে করিয়া বড় খুসী হইয়া তাহাকে একটা ১৮৲ টাকা ডজনের সিগারেট offer করিলেন। ঋতেন সিগারেট খাইত না। ধন্যবাদ দেওয়া দূরে থাকুক—সে মেয়ে লোকের সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। মিঃ বানার্জ্জি হো হো করিয়া খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, "ঋতেন বাবু বোধ হয় shocked হ'য়ে গেছেন আমাদের বিলেতে কিন্তু অহরহ এই কাণ্ডটাই ঘটছে—আপনি তো সেখানে গেলে মূর্চ্ছিত হ'য়েই মারা যেতেন।" ঋতেন আর কোন কিছু না বলিয়া লিলি মুখার্জ্জি ও তাহার প্রণয়ীর কাণ্ড দেখিয়া আর আসিব না মনে করিয়া উঠিতে যাইতেছিল। মিস্ মুখার্জ্জি একটু অপ্রস্তুত গোচের হইয়া পড়িলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ঋতেনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—আমি একটু রহস্য করছিলাম, আপনি বুঝলেন না। বসুন এক কাপ কফি খেয়ে যান।" গ্রীষ্মকালে রাত দশটার সময় ভাত খাওয়ার পর এক পেয়ালা কফি খাওয়া একটা নতুন জিনিষ মনে করিয়া ঋতেন বসিল। Boy—কে ডাকা হইল। একটি দীর্ঘশ্মশ্রু ৪৫ বৎসর বয়স্ক বৃহদাকার পাঠান আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে কফির হুকুম দেওয়া হইল। সে একটু পরেই কফি আনিয়া লিলি বাবার সামনে ধরিল।

লিলি বলিল- আজ ঋতেন বাবুদের বাংলা কবিতার একটু আলোচনা করা যাক। বিজয়া দশমীর দিন—ঋতেন এক খানি সাপ্তাহিক পত্রিকা হাতে করিয়া আসিয়াছিল। তাহা হইতে ব্যর্থ-বোধন বলিয়া একটা কবিতা পড়িল। তাহার শেষ লাইনটি—"চিন্ময়ী থাক চিত্তের তলে মৃণ্ময়ীরূপে এস না আজ।"

কবিতা পড়া শেষ হইলে তিনি বলিয়া উঠিলেন ঋতেন বাবু সব তো বুঝলাম মৃণ্ময়ীর বাংলটা কি হ'ল? ঋতেন বলুল আপনিই বলুন না কেন। লিলি ভাবিলেন আমার ডাক নাম লিলি, কিন্তু ভাল নাম মৃণ্ময়ী, অতএব চেঁচাইয়া

বলিলেন, "মৃণ্ময়ী মানে Lotus—" শ্বেতেন হো হো করিয়া হাসিয়া সেদিনকার মত প্রস্থান করিল।

বিবাহের কয়েকদিন পরেই লিলি সুতিকাজ্বরে আক্রান্ত হয়। তাহার স্বাস্থ্য চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়াছে। সে রূপলাবণ্য কোথায় গিয়াছে। যৌবনের ফুল্লশ্রী আজ বিষাদের কালিমায় লুপ্ত হইয়াছে। সে প্রায় সব সময়েই শয্যাগত থাকে। মিঃ বনার্জ্জি টাকাগুলি হস্তগত হওয়ার পর বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। সেখানেই একটি সঙ্গিনী খুঁজিয়া লইয়া বসবাসের আয়োজন করিয়াছেন। মিঃ মুখার্জ্জির মৃত্যুর পর হইতে শ্বেতেনই লিলির সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছে। সে জীবনে বিবাহ করে নাই—লিলিকে যখন চাহিয়াছিল পায় নাই আজ তাহাকে এক প্রকারে পাইয়া কতকটা তাহার মন শান্ত হইয়াছিল। সে অবাক হইয়া ভাবিত মিঃ বানার্জ্জির ব্যবহারের কথা—একদিন লিলির কাছে হাঁসিয়া বলিতেছিল, তোমাদের সমাজের সবই উল্টো যে কারণে অত বড় দাড়িওয়ালা পাঠানটা হ'ল Boy আর তোমার মত সুন্দরী যুবতী হ'ল "বাবা"—সেই কারণেই বোধ হয় আজ তোমার এমন অবস্থা।

হাফিজের-কাব্যরহস্য

৪

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(অধ্যাপক শ্রীমোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ)

এইবার হাফিজের প্রধান বিশেষত্বের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। অন্যান্য পারস্য গজল বা গীতিকবিতা-রচয়িতাদিগের ন্যায় হাফিজ কেবল মাত্র প্রেম-কবিতা রচনা করিয়াই অমর হন নাই। যদিও গজলের মূলসুরটী প্রেমাত্মক, তথাপি হাফিজ জগতের 'কমলবিলাসী'দের ন্যায় অস্থিমাংস, স্নেদ-বসা, পিণ্ড শোণিতের পূজা করেন নাই। অন্যান্য পারস্য গীতি কবিতা-রচয়িতৃগণ প্রিয়তমার বিরহে ভাষাসৌন্দর্য্যে ও ভাবসম্পদে নিজ কবিতা মহনীয় করিয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কবিতা আমাদের উচ্চ মনোবৃত্তির মার্জ্জন পক্ষে কখনই উপযুক্ত নহে। ইরাণী যুবতীর মোহিনীমূর্ত্তির ছাপ্ লইয়া সে

কবিতা যখন মহাকালের দরবারে দাঁড়াইবে, তখন কোথায় তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহা আমাদের ও অভাব্য। হাফিজের পক্ষে কিন্তু একথা বলা চলে না। তিনি এরূপ ভাষাও ভাবের অনুগামী নহেন; তাঁহার কবিতা ভাষার তূর্ণ পক্ষে ও ভাবের চারু অঙ্গাভরণে সমৃদ্ধ হইয়া চিরসুন্দর ও চিরমঙ্গলের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তাঁহার সঙ্গীতে এই সমস্ত রসের একটা ব্যাপক ও অনির্দ্দেশ্য বিশেষত্ব আছে। দ্ব্যর্থ প্রকাশক রহস্য-কবিতার ন্যায় তাঁহার প্রেম-কবিতা মানবীয় প্রেম ও স্বর্গীয় প্রেম—উভয়ের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে। এই প্রীতিপূর্ণ স্থিতি-স্থাপকতা ও অস্পষ্টতাই তাঁহার কাব্য সৌন্দর্য্য অনবদ্য ও অনিন্দ্য করিয়া দিয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে সমভাবদ্যোতক কবিতা-প্রকাশের জন্য তাঁহার ভাষার নানারূপ অর্থ করা যায়। প্রেমিকের নিজ হৃদয় রঞ্জিনীর প্রতি সম্ভাষণ পরমেশ্বরের মহান্ সত্তার মধ্যে সুফী কবির আত্মলোপেচ্ছা, অতৃপ্তের বাঞ্ছিত অন্বেষণ এই সকল ভাব তাঁহার সঙ্গীতে গভীর বেদনায় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চ এবং পবিত্র প্রেমের সরল ব্যঞ্জনায় তাঁহার "দীবান্" ভাবের রত্ন-মঞ্জুষা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

শুধু কি প্রেমের মূর্চ্ছনাই তাঁহার বীণায় বাজিয়াছে?—আরও সুগভীর, আরও গূঢ়তম ভৈরবীর করুণ মন্ত্র তাঁহার দর্শনবাদের মধ্যে বাজিয়াছে। তিনি বলিলেন—আমাদের 'নিজ-হাতে-গড়া' দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ, স্বল্প ও অনিশ্চিত জীবনকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেন সেই দুঃখের মধ্যে ও আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠে দারিদ্র্যের মাঝে ও যেন প্রেমের কনকমাধুরী জাগিয়া উঠে। —ইহাই হাফিজের কবিতার দর্শনবাদ। পাপে তাপে পূর্ণ এই সংসার—কেমন করিয়া ইহার মধ্যে শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করিব; হাসি-অশ্রু, জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন—কেমন করিয়া গ্রহণ করিব; কেমন করিয়া গর্ব্ব-ত্যাগ করিয়া 'সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে' আপন আপন আসন খুঁজিয়া লইব; কেমন করিয়া জীবনের মহাসমুদ্র নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া মহামরণের অমর বন্দরে পৌছিব, কবি আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন। জীবন এবং ইহার আনুষঙ্গিক পার্থিব বস্তুর নশ্বরতা; সংসার এবং তদন্তর্গত সমস্ত বস্তুর পরিবর্ত্তনশীলতা,—এই সকল চিন্তার ধারা তিনি বিচিত্র বর্ণ বৈভব সম্পন্ন তুলিকায় কাব্যের পটে আঁকিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন—'ধূলি-মুষ্টির মধ্যে তোমার অন্তিম-শয়ন-ভবন রচিত হইবে, বল তবে কেন আকাশ-

স্পর্শী প্রসাদ নির্ম্মাণে তোমার এত গর্ব্ব ?, (গজল ৭ শ্লোক ৭)। পলে পলে যখন জীবন ফুরাইতেছে, তখন কেন আমরা সুখ দুঃখের দাস ? তিনি বলিতেছেন—সুখ দুঃখকে জীবনের সঙ্গী করিও না। তাহারা দুদিনের ছায়া, মুহূর্ত্তেই মিলাইয়া যাইবে। তিনি ক্রমাগতই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, গোলাপের পাশেই কণ্টকপল্লব আছে, কণ্টকবিদ্ধ না হইয়া কেহই গোলাপ ছিন্ন করিতে পারে না। অন্যত্র তিনি বলিতেছেন—'বাহারের' (বসন্তের) পশ্চাতেই 'খিজান' (শরৎ) আসে, সুখ দুঃখ সনাতন ক্রমবিকাশের ফল। সৃষ্টির বনিয়াদ যখন এইরূপ ভূমির উপর নির্ম্মিত, তবে কেন হাহাকার করিয়া মর ? কেন দেখ না যে—'অদূরে রয়েছে চির বসন্ত-প্রভাত ?'

দুঃখের মর্ম্মস্পৃক্ যাতনায় পরিশ্রান্ত কবি মদিরা-চষকের আবাহন করিয়াছেন। তিনি বলেন—

'ভোগ্যের লীলা দিব গো বলিয়া
মদিরাপাত্র দাও গো চুমি—
তাহারি বদন করেছে প্রেমিক
গন্ধে তাহার পাগল আমি !' (গজল ২৭)

মদিরা হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়া দেয়, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ—প্রেমের উন্মত্ততা, কিংবা সেই স্বপ্নময় অলসতাপূর্ণ আবেশ, যাহা হৃদয়ের অন্ধকারে ঊষার অরুণলেখা আনিয়া দেয়। কালো মেঘের কোলে রজতরেখার ন্যায় এই মদিরা সন্তপ্তের চিরতৃপ্তি, দুঃখিতের চিরশান্তি, ব্যথিতের চিরসান্ত্বনা !—ইহা আমাদের নিজের কথা নয়, কবি নিজেই এ রহস্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন ;—"তুমি চলিয়া যাও প্রেম-মদিরার ধূমজাল ত তোমার মাথায় নাই ; তুমি যে আঙ্গুরের রসে (অর্থাৎ প্রকৃত মদ্যে) উন্মত্ত।" আর একটী গজলে তিনি গাহিয়াছেন—

'মদিরা—মোহিনী—মুরজ না লয়ে
গোলাপের কালে বেঁচে কি ফল ?
সময়েরি মত নশ্বর তারা—
সপ্তাহ শুধু করে গো ছল !'

আমরা আর এ রূপক-রহস্য ভাঙ্গিব না। প্রত্যেক চঞ্চল মুহূর্ত্ত হইতে আনন্দ ও প্রীতি উপভোগ করাই আমাদের কবির ধর্ম্মবাদ। এ আনন্দ এবং প্রীতি ইন্দ্রিয়-সেবার প্রতিশব্দ নহে—কবি ইহা কোন্ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন,

আমরা ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ওমর খৈয়াম তাঁহারই সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলেন—

"সত্য শুধু বর্ত্তমান—অসত্য সকলি,
শুধু সুধা—শুধু গান—শুধু তুমি সৎ।" (৺অক্ষয় কুমার বড়াল)

বৃথা দুঃখ দূর করিয়া দাও—আনন্দ-সাগরে পরিস্নাত হইয়া কেবল সুখ-সুধা সেবন কর; সংক্ষেপতঃ, ইহাই হাফিজের দর্শনবাদ। ইহাতে নূতন কিছুই নাই বটে, কারণ ইহার কোন কোন অংশ Stoicism ও Epicureanismএর প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের দেশের চার্ব্বাকগণের "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণংকৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" বচনও হাফিজের সুখবাদকে পরাজিত করিয়াছে বলিতে পারি, কিন্তু হাফিজের সুখবাদের মূলে আধ্যাত্মিকতার যে উপাদান আছে, তাহা আর কোথাও নাই। এই সুখবাদ আনন্দের তপোবন স্বরূপ। ধ্যানী কবি সেই মানস-রচিত তপোবনে অপূর্ব্ব কল্পলোক সৃষ্টি করিয়া লোক-মোহিনী কবিতাসুন্দরীকে রাজরাণী করিয়াছেন। আমরা সেই ভাব-রত্নাকরের দুই একটী মণিকণা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম:—

(ক) বসন্তকাল সমাগত—এইবার সাবধান হও; কারণ ইহার পরে অনেক পুষ্প বিকশিত হইবে, তুমি হয়ত তখন মৃত্তিকার নিম্নে (প্রোথিত) থাকিবে!

(খ) যে কাননে 'বাহারের' (বসন্তের) পর 'খিজান্' (শরৎ) আসে, চতুর বিহঙ্গ সেখানে কখনও গান গাহে না। (পারস্যের শরৎকাল ঝটিকা সঙ্কুল)।

(গ) সকলের সহিত আমোদ প্রমোদ কর; দুইমুখে যাহার দ্বার (জীবন মরণরূপ দুই দ্বার—অর্থাৎ পৃথিবী) সেই পান্থ-নিবাস হইতে একবার বাহির হইয়া আবার আসিতে পারিব কিনা, কে জানে!

(ঘ) হে হাফিজ, এই পৃথিবীর কানন শরৎ-ঝটিকায় বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া আঁধারে ডুবিও না। সত্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া দেখ দেখি—কোথায় কণ্টক শূন্য কুসুম আছে!

অন্য একটী কবিতার একাংশে (গজল ৮, শ্লোক ১) সৌন্দর্য্য রসিক কবি মুক্তকণ্ঠ হইয়া বলিতেছেন—'তাহার একটী কৃষ্ণতিলকচিহ্নের জন্য আমি সমরখন্দ ও বোখারা দান করিব।' এই স্থলে বলা আবশ্যক যে সেকালে পারস্য-যুবতীগণ pitch এবং Oxide of antimony নামক এক তীব্র বিষ প্রয়োগে অস্থায়ী তিলক চিহ্ন ও chelidoniun এবং charcoal সহযোগে

স্থায়ী তিলক-চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করা সৌষ্ঠব সাধক মনে করিত! তাই হাফিজ বলিতেছেন—

কুন্তল তা'র—বন্ধনজাল,
কৃষ্ণতিলক—শস্যকণা;
তাহারই আশায় বন্ধুর জালে
পড়িয়াছি আমি অন্যমনা। (গজল ৩০)

হাফিজ জীবন-মরণের কথাও ভাবিয়াছেন, বিশ্ব-নিয়ন্তার কথা, বিশ্ব-রহস্যের কথাও ভাবিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন, রহস্যের দ্বার চিররুদ্ধ থাকুক, মানুষ নিজ ক্ষুদ্রবুদ্ধির আলোক-বর্ত্তিকা লইয়া সে অন্ধকার ভেদ করিতে যাইয়া যেন হাস্যাস্পদ না হয়! ইহাই কি সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে উদারতম মত নহে? সংসারের দুরন্ত বনে এই ধর্ম্মবাদই তাঁহাকে উৎসাহ ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়া নববলে বলীয়ান করিয়া দিয়াছে। আত্মশক্তি ও ভাগ্য, পাপ ও দুঃখ—সমস্তই কবি তাঁহার কবিতার বিষয়ীভূত করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মের মূল কথা এই যে—ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র। হাফিজ যে প্রকারে ইহা বুঝাইয়াছেন, তাহা কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত নহে। তিনি মানবিকতা ও আস্তিক্যবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সমস্ত ইঙ্গিত ও স্ফুটোক্তি করিয়াছেন, তাহা স্বাভাবিকতায় ও ক্ষুদ্রতায় বিরাট্‌বপুদর্শন ও ধর্ম্মগ্রন্থ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। আমরা কয়েকটী গজলের অনুবাদ দিলাম :—

(ক) আমাদের জীবন একটা রহস্য বিশেষ—ইহার সমাধান চেষ্টা ব্যর্থ ও কাল্পনিক।

(খ) হে সাকী, পানপাত্র দাও—অদৃষ্ট নিয়ামক আমাদের ভাগ্যে যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া কি লিখিয়াছেন, তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর।

(গ) মদ্য এবং গায়কের কথা কও—বিশ্বরহস্যের কথা কহিও না, কারণ কোনও দর্শন-শাস্ত্র এ পর্য্যন্ত ইহা নির্ণয় করিতে পারে নাই, পারিবেও না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাফিজ ধর্ম্মের 'ভান্' বা ধর্ম্মজীবনে 'ঝুটা'র আদর দেখিতে পারিতেন না। আমাদের বোধ হয়, হাফিজের সময়ে একদল দুষ্টলোকের প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহারা কপট ধার্ম্মিকতা ও সাধনকৃচ্ছ্রতা জয়-ডঙ্কার সহিত সাধারণে প্রচার করিয়া গোপনে কলুষিত জীবন অতিবাহিত করিত। ইহাদের প্রতারণা সমাজের অনেক সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সাধারণের অন্ধ বিশ্বাসের ছায়ায় এই আগাছা সমূহ পরিপুষ্ট হইয়া কেবল সাংসারিক সুখকেই আত্মসর্ব্বস্ব

করিয়া লইত। সকল দেশেও সকল কালে এই দল parasite বা পরান্নপুষ্টের ন্যায় সমাজদেহে গূঢ়রূপে বিজড়িত হইয়া আছে। এই দলের বিরুদ্ধেই হাফিজ্ একটু কটূক্তি করিয়াছেন। তিনি যেন নিষ্ঠুরতার সহিত এই বৈড়াল ব্রতিকগণের কীর্ত্তি কথা সাধারণের সমক্ষে দেখাইয়া দিয়াছেন। পারস্যের অন্যান্য কবিগণও এই দুষ্টদলের প্রতি গালিবর্ষণ করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু সাধারণ কবিগণের সহিত হাফিজের এ বিষয়ে একটু পার্থক্য আছে।

(৫)

ছদ্মবেশে সাধারণের ও সমাজের অনিষ্টসাধন করা যাহাদের একমাত্র ব্রত তাহারাই কবির লক্ষ্য। তাহাদের বিরুদ্ধে হাফিজ্ "রিন্দ" নামক একপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছেন। যে উচ্ছৃঙ্খল ও বাধাশূন্য জীবন যাপন করে, তাহাকেই রিন্দ্' বলে। কিন্তু মদিরার ন্যায় হাফিজ্ এই শব্দটীও রূপকার্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যে নির্দ্দোষ ও অকলঙ্ক জীবন যাপন করে, যাহার বাক্যে ও কার্য্যে 'সদর-বাহির' নাই, যিনি ধর্ম্মের নামে সমস্ত সাধনা মন্ত্র-পূত করিয়াছেন—হাফিজ্ তাহারই নাম দিয়াছেন 'রিন্দ্'। নিম্নোক্ত কবিতাগুলি এই ভাবেরই পরিচায়ক—

(১) রঞ্জিত বসনের নিম্নে তাহারা গুপ্তজাল রাখিয়া দেয়—এই সমস্ত মিথ্যাবাদী ভ্রাতৃগণের অন্যায়াচরণ দেখিয়া চলিও।

(২) সন্ন্যাসী তাহার গর্ব্ব ও উপাসনামন্ত্র লইয়া আসুক, আর আমি আমার ত্যাগ ও বৈরাগ্য লইয়া যাই;—দেখি, পরমেশ্বর কাহাকে নির্ব্বাচন করিয়া লন!

ভক্তের এমন সাহসিকতা দেখিয়াছ কি?

এই সমস্ত উচ্চ কল্পনা নরপ্রেমে অমর মহিমা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু কল্পনার শূন্য লোকে ও ভক্তির তপোবলেই হাফিজের সমস্ত জ্ঞান পর্য্যবসিত হয় নাই। জাগতিক জ্ঞানও তাঁহার বড় অল্প ছিল না। জগতের মরুদহনে পিপাসা-ক্লান্ত কবি যে 'ওয়েশিশের' সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা কেবল নিজের জ্বালা জুড়ান নাই—সমস্ত জগতের লোককে তিনি সেই 'আনন্দ-যজ্ঞে নিমন্ত্রণ' করিয়াছেন। সাধক কবি বিজ্ঞ বিষয়ীর ন্যায়, চতুর গৃহস্থের ন্যায় যে উপদেশামৃত পরিবেষন করিয়াছেন, তাহা আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের, কল্প-কল্পান্তের রাক্ষসী ক্ষুধা মিটাইয়া দিবে। তখন নোবেল্ প্রাইজ্ ছিল্ না,

থাকিলে শান্তি-মন্ত্রের গুরু হাফিজ্‌ও বোধ করি একটা পাইতেন। একটী কবিতায় তিনি বলেন—

'উভয় লোকের শান্তি-মন্ত্র
একটী মন্ত্রে পেয়েছে স্থান—
বন্ধুর প্রতি দয়াশীল হও,
মার্জ্জনা কর অচিরে দান।'

হাফিজের কবিতা আন্তরিকতার মুক্ত প্রস্রবণ। গঙ্গা-যমুনার প্রয়াগ সঙ্গমের ন্যায় তাঁহার ভাব ও ভাষা অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্মিলিত হইয়া অসীমের পানে ছুটিয়াছে। বৈষ্ণব সাধক যেমন বিরহিনী নারী সাজিয়া উদ্বেগাকুল হৃদয়ে 'শাঙন নিশায়' আপনার প্রেমাস্পদের জন্য অপেক্ষা করেন, হাফিজ ও তদ্রূপ আপনার সত্ত্বা, আপনার ব্যক্তিত্ব, আপনার অভিজ্ঞান সেই মগরাজরসিকের পদে বিলীন করিয়া বলিতেছেন —

"তোমার অধরে ও আকৃতিতে স্বর্গের সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে।······সমস্ত রজনী আমার নয়ন যেমন তোমার পানে চাহিয়া থাকে, তেমনি আকাশের নদী ঘুমন্তভাবে তোমার পাগল করা চোখের পানে চাহিয়া আছে। প্রত্যেক বৎসরে বসন্তেই তোমার সৌন্দর্য্য বিকশিত হয় প্রত্যেক পুস্তকে স্বর্গের সঙ্গেই তোমার উপমা দেওয়া হয়। আমার হৃদয় যে জ্বলিয়া গেল, নাথ! আমার মন যে আজিও মনোচোরের দেখা পাইল না! যদি তার কামনা পুরিত, তাহা হইলে কি সে শোণিত-মোচন (অর্থাৎ শোকাশ্রুমোচন) করিত? আমি জানি তোমার গোলাপীগণ্ডে মুক্তা-জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে—এই মুক্তা আচার জগৎ প্রকাশক সূর্য্য হইতে উৎপন্ন। মোচন কর তোমার গুণ্ঠন! ওগো, আর কতদিন তোমার লজ্জা থাকিবে? গুণ্ঠন দিয়া তুমি ত কেবল লজ্জাকেই বাঁচিয়া রাখিয়াছ! গোলাপ তোমার মুখ দেখিয়া (ভালবাসায়) অগ্নি-গর্ভে ঝাঁপ দিয়াছে (তাই সে রক্তবর্ণ) সে তোমার গন্ধে আকুল হইয়া লজ্জায় গোলাপ-জলের মত কোমল ও স্নিগ্ধ হইয়াছে! তোমার মুখ দেখিয়া হাফিজ্ আজ পাগল!—দেখ, আজ হাফিজ্ দুঃখ-সাগরে পড়িয়া মৃত-কল্প। ওগো, এসো, এসো, একবার এসো—আমায় রক্ষা কর!"

হাফিজের কবিতার কয়েকটী মুখ্য বিশেষত্বের সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম; তাঁহার চিন্তার ধারাও দেখাইলাম। কিন্তু কবির বর্ণরাগ, রেখাবৈচিত্র্য ও সীমান্ত-লীন পরিপ্রেক্ষিত দেখাইতে পারিলাম না। কবিতামোদিগণের নিকট

হাফিজের **দীবান** বিধাতার দান বলিয়া চিরকাল পরিগণিত হইবে। জীবনের ঈশানকোণে যখন দুঃখের জলভরা কালোমেঘ জমিয়া যায়, তখন অনেকে হাফিজের কবিতার আশ্রয় লন; অনেকে আবার কুসংস্কারবশতঃ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে লক্ষ্মীর বড়পুত্র হইবার জন্যও হাফিজের কবিতা বুকে তুলিয়া লন। হাফিজের একটী নাম—"লিশান্-উল-গায়েব্"—গুপ্তের জিহ্বা, যিনি গুপ্তকে প্রকাশ করেন। রুকৃনী নদীর কূলে ও মুশাল্লা মস্‌জিদের সন্নিকটে "লিশান্-উল-গায়েবের" পাঞ্চভৌতিক দেহ আজ ছয়শত বৎসর হইল ধূলির সহিত ধূলি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিও তাঁহার স্বর্গীয় জিহ্বা বিশ্বের মাঝে সগৌরবে গাহিতেছে—

অঙ্গে যদি বা লাগে ধূলাবালি
কিবা ক্ষতি, বল, তায়?
বিপুল এ ধরা তাঁহারি পুণ্যে
অমলিন গরিমায়!

অচেনা

[শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ]

আমি চিনেছি তোমারে বহুরূপী
ওগো চির পুরাতন অচেনা,
তুমি খেলিবার ছলে চুপি চুপি
কর কতই বিলাস রচনা।
আজি নিদাঘ গগন বিদারিয়া
তব কঠোর ফুলীশ গরজে,
সারা বিশ্ব-প্রকৃতি মুখরিয়া
যেন ভীষণ দৈত্য তরজে।
ঘন ঝটিকা করিছে হাহাকার
তার চির আশ্রয় হারায়ে,
বাজে কানন-বীণার ছেঁড়া তার
সারা জটাময় মাথা নাড়ায়ে।

তব রুদ্র রাগের আলাপনে
করে মহাপ্রলয়ের সূচনা ;
আমি চিনেছি তোমারে মনে মনে,
ওগো চির পরিচিত অচেনা !

আমি চিনেছি তোমারে হে অতিথি,
ওগো চির পুরাতন অচেনা,
তুমি নব বেশে সাজি নিতি নিতি
কর নব নব ভাব রচনা।
নব অরুণ-কিরণ জাগরণে
হাসে উষার মাধুরী ছড়ায়ে,
হেরি প্রতি পল্লব আবরণে
আছে তোমার সুষমা জড়ায়ে।
সবে প্রভাতের পাখী গাহে গান
তার রঙীন্ পাখাটি নাড়িয়া,
বহে সে স্বর-লহরে তব তান
সারা উদয় গগন বেড়িয়া।
কম কমলিনী মেলি যুগ আঁখি
করে কাহার প্রণয় যাচনা !
আমি নীরবে কেবল চেয়ে থাকি,
ওগো চির-জনমের অচেনা।

আমি চিনেছি তোমারে হে মহান্,
তুমি চির পুরাতন অচেনা,
সারা ধরণী ধরিয়া সম তান,
করে তোমার প্রণয় যাচনা।
যবে মধ্য তপ্ত গগনের
প্রতি রৌদ্র কণিকা বিকাশে,
সে যে তোমার অমৃত লগনের
শুভ চরণ-চিহ্ন প্রকাশে।

যেন সন্ন্যাসী বসি একমনে
করে নীরবে কাহার সাধনা,
কোন্ পিয়াস লাগিয়া সরোদলে
কোন সাগরে জানায় বেদনা।
তব তুষার শুভ্র রূপ হেরি
লাজে লুকায় ব্যাকুল যাচনা;
বাজে গগনে তোমার জয়-ভেরী,
ওগো ও আমার চির অচেনা!

আমি চিনেছি তোমারে হে শ্যামল,
তুমি আপনার জন অচেনা;
বহে করুণা তটিনী ছল ছল
সে তো পর কি আপন বাছেনা।
তুমি শান্ত শীতল শ্যাম সাঁঝে
কর শান্তির অবতারণা,
এই মুখর হাটের পথ মাঝে
কর চুপি চুপি পদচারণা।
যবে অস্ত গগনে ম্লান রবি
পড়ে শ্রান্ত ক্লান্ত ঘুমিয়া,
তব স্নিগ্ধ বিমল রূপ-ছবি
নাচে ধরণীর বুক চুমিয়া।
তুমি সন্ধ্যা-ধূসর ধূমাকাশে
আছে পাতিয়া তারার বিছানা
আমি চিনেছি তোমারে সে আভাসে,
ওগো ও আমার চির অচেনা!

আমি চিনেছি তোমারে হে দেবতা,
তুমি আপন অথচ অচেনা,
তব গভীর সৌম্য নীরবতা
করে রম্য মিলন রচনা

তব নীরব নিশীথ-গীত বাজে
প্রতি তারার তরুণ পরাণে,
তার হিয়ার গোপন গৃহমাঝে
হাস রাকা তুমি রাকা-কিরণে।
তব চন্দ্রধৌত ব্যোম-পথে
আছে হাসির উছল ঝরণা,
সে যে রজত-জড়িত ছায়া-রথে
করে ভূমিতলে অবতরণা।
চারু কৌমুদী-বাঁধা নদীতটে
খেলে তোমারি অমল জ্যোছনা,
হেরি উদার মাধুরী ঘটে-পটে
ওগো সকল যুগের অচেনা!

আমি চিনেছি তোমারে চিনেছি গো,
ওগো সারা হৃদয়ের অচেনা,
তুমি নিবিড় আঁধারে জাগো জাগো,
কর অকূলে দেউল রচনা!
আজি ঝর ঝর ঝর বহে বারি,
নাচে থর থর থর মরুতী,
আমি এ বিশাল ঘন ঘটা ভরি
হেরি তব মঙ্গল আরতি।
আজি উতলা কণ্ঠে ধরারাণী,
করে বজ্র-বারতা ঘোষণা,
শুনি অকম্পিত সেই সামবাণী
ধীরে লুকায় ব্যাকুল বাসনা।
ওগো তোমার রুদ্র রূপ হেরি
প্রাণে মুছে যায় অনুশোচনা;
ওগো মুক্ত ভীষণ ব্যোমচারী!
ওগো চির পুরাতন অচেনা!

আজি তোমার রাতুল শ্রীচরণে,
ওগো ও আমার চির অচেনা,
আমি নীরবে রচিব সযতনে
মম চির চরমের বিছানা।
আমি দু' হাতে ছিঁড়িয়া এ পরাণ,
লব রক্ত অর্ঘ্য সাজায়ে ;
গাব মরণের শুভ জয় গান
সুখে সকল বাসনা বাজায়ে।
কবে মুছে যাবে মোর সীমা রেখা,
এই যুগ-যুগব্যাপী হীনতা,
কবে জ্বলিবে অসীম দীপ-লেখা
নাশি আঁধারের মৃদু ক্ষীণতা।
ওগো মঙ্গল তুমি সব কাজে,
কর চির মঙ্গল সূচনা,
এস আমার আকুল হিয়া মাঝে
ওগো চির আপনার :অচেনা।

বর্ত্তমানভারত ও রবীন্দ্রনাথ

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়]

কবিকুল তিলক, বিশ্ববিশ্রুত শ্রীরবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর নানা স্থানে "বিশ্বভারতীর বার্ত্তা" প্রচার করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন, জগতের লোক তাঁহার মুখে বিশ্বপ্রীতি ও বিশ্বমানবিকতার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে—চারি দিক হইতে প্রতিদিন অজস্রধারে, সম্মান ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। দেশের ভিতরে ও বাহিরে এতাদৃশ সম্মান লাভ করা, বোধ করি কোন যুগে, কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। আমরা বাঙ্গালী—বাঙ্গালী কবির এই সম্মানে গৌরবান্বিত। যিনি এমনই ভাবে আমাদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন,

তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ—ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, তাঁহার সাধনা জয়যুক্ত হউক।

প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে, যে কবি, "ওমা সোণার বাঙ্লা তোমায় বড় ভাল বাসি," 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে" প্রভৃতি সঙ্গীত রচনা করিয়া সমগ্র দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, এখন আর সে রবীন্দ্র নাথ নাই। সমগ্র জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও সাধনা, তাঁহার সঙ্গীত ও রচনায় আর তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে না। রবীন্দ্র নাথ এখন আর জাতীয় কবি নহেন, তিনি বিশ্বমানবের কবি, জগতের কবি। তাঁহার কাব্যে ও বক্তৃতায়, সঙ্গীতে ও ছন্দে—এখন সমস্ত বিশ্বমানবের ব্যাকুলতা ও আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হইতেছে, তাই সমগ্র জগত তাঁহাকে আপনার বলিয়া—বরণ করিয়া লইল। তাঁহার এখনকার বাণী কেবল ভারতের জন্য নহে—সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। যে দিন তাঁহার কবি প্রতিভা বিশ্বমানবিকতার প্রথম সন্ধান পাইয়া, দেশে বিদেশে, সেই বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল, সেই দিন হইতেই, দেশের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সংযোগ ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল। দেশের সুখ, দুঃখ, আশা নিরাশা আর তেমন ভাবে তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল না। তিনি ভাবুক—ভাবের রাজ্যেই চলাফেরা করিতে লাগিলেন এবং ক্ষুদ্র জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়াইয়া যতই উর্দ্ধতর প্রদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন—বিশ্বমানবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ততই ঘনিষ্টতর হইতে লাগিল বটে কিন্তু দেশের প্রাণ বস্তু হইতে তিনি সেই পরিমাণে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহার জন্য আমরা তাঁহাকে দোষ দিই নাই—কল্পনা লইয়াই যাঁহাদিগের কারবার--ইহাই তাঁহাদিগের স্বাভাবিক পরিণতি। জগতের অনেক প্রসিদ্ধ কবিই এই-রূপে কল্পনা লইয়া খেলা করিতে করিতে পরিশেষে কল্পনা-বিলাসী হইয়া—mystic নামে অভিহিত হইয়াছেন। আমাদিগের রবীন্দ্র নাথের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। জগৎ ইঁহা-দিগের কল্পনার অপূর্ব্ব লীলা-চাতুর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকে এবং ইঁহাদিগকে এক দুর্ব্বোধ প্রহেলিকাময় উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করে। ইঁহাদিগের সহিত দৌড়িবার শক্তি জগতের নাই। সুতরাং জগৎ ইঁহাদিগকে গ্রহণও করে না, প্রত্যাখ্যানও করে না। সংসার-বিভ্রান্ত মানব দুঃখ শোকে অবসন্ন হইয়া এক এক বার ইঁহাদিগের বাণীকে সংসার-পীড়ার পরমৌষধি জ্ঞানে বরণ করিয়া লইতে অগ্রসর হয় বটে কিন্তু, আদর্শের বিশালতায় আচ্ছন্ন হইয়া, আপনাদিগের অক্ষমতায় শেষে আপনারাই

ক্লিষ্ট হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসে। বিগত মহাসমরের পর, জগতের নরনারীর মধ্যে ঠিক এইরূপ একটা অশান্তি ও অস্থিরতার ভাব দেখা গিয়াছিল—তাই রবীন্দ্র নাথের এত সমাদর।

এই ত জাতি সংঘের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। কিন্তু জগতের মধ্যে বিরোধ ও অশান্তির মাত্রা কমিল কি? বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে। যদি মুখের কথায়, কলমের খোঁচায় কিংবা শূন্যগর্ভ চোখরাঙ্গানিতে মনুষ্যসমাজের চিরন্তন সংস্কার ও প্রকৃতি বদলাইয়া দিতে পারা যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। এরূপ চেষ্টায় ব্যাধির বীজ বিনষ্ট হয় না, কিছু-দিনের জন্য, তাহার অভিব্যক্তিতে বাধা পড়ে মাত্র। কিন্তু জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাতে ও লাভ আছে।

আমাদিগের মনে হয় এই জাতিসংঘ যে ভাবেও যতটুকু গড়িয়া উঠিয়াছে, রবীন্দ্র নাথের "বিশ্বভারতীর" কল্পনা সে ভাবে ও তত টুকুও গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। এই কল্পনা গড়িয়া তুলিবে কে? রবীন্দ্রনাথ? রবীন্দ্রনাথের পিছনে সে জনশক্তি কোথায়? যে দুর্ব্বার দুর্জ্জয়শক্তি জগতের জাতি সমূহকে আদেশ করিতে পারে—বাধ্য করিতে পারে—অন্ততঃ—তাহাদিগের সহিত সমপর্য্যায়ে অধিষ্ঠিত হইয়া জগতের সমক্ষে আপনার আহ্বানলিপি—প্রেরণ করিতে পারে ভারতের সে শক্তি কই? যদি বল, "আমরা এ শক্তি চাই না, আমরা আধ্যাত্মিক বলে জগৎ জয় করিব।" কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, আমাদিগের সে আধ্যাত্মিক বলই বা কোথায়? সত্য বটে, আমাদিগের বেদ আছে, বেদান্ত আছে—গীতা আছে, উপনিষদ আছে, পুরাণ আছে—রামায়ণ,মহাভারত আছে—সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র আছে কিন্তু আমাদিগের সে সাধনা কই? সে সংযম কই? সে ত্যাগ কই? সে চরিত্র বল কই? শুধু মুখের কথায় আধ্যাত্মিকতা মিলে না। আমরা বক্তৃতার সঙ্গে দুই চারিটি উপনিষদের বাণী ছিটাইয়া দিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীকে চমকিত করিয়া দিতে পারি এবং তাহাই আমাদিগের আধ্যাত্মিকতার সর্ব্বোচ্চ দাবী ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি, কিন্তু জগতের লোক কি শুধু মুখের কথায় ভুলিবে? আমরা মোটা কাপড় পরি না, পাছে গায়ে আচড় লাগে, দেশের কথা ভাবি না বা ভাবিতে ও চাহি না, পাছে দেশের জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। দেশ চুলোয় যাক্, আমি এবং আমার স্বজনগণ সুখে থাকিলেই হইল—ইহাই আমাদিগের বুদ্ধি—ইহাই আমাদিগের প্রবৃত্তি। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদিগের

আধ্যাত্মিকতার দাবী সাজিবে কেন ? ত্যাগ ও সংযমই অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি স্বরূপ। সেই ত্যাগ ও সংযমকে বাদ দিয়া শুধু ফাঁকা কথার উপরে জগতে প্রেমের রাজ্য গড়িয়া উঠিবে কি ?

রবীন্দ্রনাথের কল্পনা, কল্পনা হিসাবে খুবই উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ উহাই ভারতের চরম আদর্শ হওয়া উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ প্রকারান্তরে ঠিক এই ভাবের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, ভারতকে প্রথমতঃ সভ্যজগতে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। দাসত্বের টীকা যাহাদিগের ললাটে বিদ্যমান, তাহারা কেমন করিয়া জগতের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে ? এই জন্যই মহাত্মা গান্ধী প্রথমেই ভারতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছেন এবং ত্যাগ, সংযম ও অহিংসাচরণ প্রভৃতির দ্বারা যুগযুগান্তের পাপরাশি ক্ষালিত করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথও স্বয়ং যে এ কথা বোঝেন না, তাহা নহে। তিনি জানেন, বড়র সহিত বড়র মিলনই প্রকৃত মিলন ; বড় এবং ছোটর যে মিল তাহা বস্তুতঃ মিল নহে, গোঁজামিল মাত্র। বহুপূর্ব্বে, তিনিই তাঁহার "হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেনঃ—

"আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়। যতদিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্রতা – ততদিনই তাহার ঈর্ষ্যা ও বিরোধ। ততদিন যদি সে কাহারো সহিত মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে—সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোট বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ, বড় হইয়া আত্ম বিসর্জ্জন করাটাই শ্রেয়ঃ।" (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৮)

অতএব প্রাচী ও প্রতীচীর সম্মিলন ঘটাইতে গেলে প্রাচীকে প্রতীচীর সমান হইতে হইবে—নচেৎ, প্রকৃত মিলন অসম্ভব। এই জন্যই আমাদিগের মনে হয়, মহাত্মার কার্য্য যেদিন শেষ হইবে, সেইদিন হইতেই, প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্র-নাথের কার্য্য আরম্ভ হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যদি মহাত্মার সহিত বাহ্যতঃ সম্পূর্ণ একমত না হইয়াও (আমরা কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোনরূপ বিরোধ আছে বলিয়া মনে করি না, বস্তুতঃ রবীন্দ্রের মত মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানের পূর্ণ পরিণতি বা উপসংহার মাত্র) তৎপ্রবর্ত্তিত আন্দোলনের সহায়তা করেন, তাহা হইলে, প্রকারান্তরে আপনার সঙ্কল্পকে

সিদ্ধির দিকেই অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইবে। তিনি যদি তাহা না পারেন ত কিছুদিন চুপ করিয়া থাকুন, মহাত্মাকে আপনার কার্য্য করিবার অবসর দিন; নচেৎ, তাঁহার আদর্শের মূলসূত্রটি ধরিতে না পারিয়া, নানা লোকে নানা কথা বলিতেছে এবং শত্রুপক্ষ এই সুযোগে মহাত্মার সহিত তাঁহার মতের কাল্পনিক বিরোধের দিকটা অন্যায়রূপে চিত্রিত ও প্রচারিত করিয়া আপনাদিগের কাজ হাঁসিল করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার ফলে সংশয় মূঢ় বাঙ্গালী অপেক্ষাকৃত বিঘ্নসঙ্কুল শ্রেয়ের পথ ছাড়িয়া সুখাকীর্ণ প্রেয়ের পথকেই বরণ করিয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

আর একটি কথা, সেদিন রায় বদরী দাস বাহাদুরের বাড়ীতে কলিকাতা সেবা সমিতির অভ্যর্থনা সভায় তাঁহাকে আমরা এই ভাবের কথা বলিতে শুনিয়াছি "তোমরা কি এখন, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মত তুচ্ছ রোগ শোক, দুর্ভিক্ষ, অন্ন-সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌বে? আমি বিশ্বের সভায় নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছি—ঐ তারা আস্‌ছে—তারা তোমাদের দিকেই চেয়ে রয়েছে। তোমরা এখন তোমাদের যত কিছু সমস্যা—দুঃখ, শোক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী— সব ভুলে, তাহাদিগের অভ্যর্থনার আয়োজন কর। আমাকে অভ্যর্থনা না করে, তাহাদিগকে তাহাদিগের ঈপ্সিত "অমৃত" পরিবেশন করিবার জন্য উদ্যোগী হও।" কথাগুলি শুনিয়া, অপরের কি মনে হইয়াছিল জানি না, আমরা কিন্তু নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলাম। যখন গৃহের চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত তখন যদি কেহ আসিয়া গৃহস্বামীকে বলে "যাও, অতিথি তোমার দ্বারদেশে—অতিথি সৎকার কর! তুচ্ছ গৃহরক্ষার মোহে অতিথি সৎকাররূপ মহাব্রত হইতে বিরত হইও না।" তাহা হইলে, সেই কথাগুলি তাহার কর্ণে যেরূপ বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি, বর্ত্তমান সময়ে, আমাদের কর্ণেও ঠিক সেইরূপ বোধ হইয়াছিল। ভারত এক্ষণে ঘোর দুর্দ্দশাপঙ্কে নিমগ্ন। "বিশ্বমৈত্রী" "বিশ্বভারতী"র কথা এক্ষণে তাহার ভাল লাগিবে কি? অগ্রে তাহাকে এই দুর্দ্দশাপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহার পর বড় বড় কল্পনা বা আদর্শ তাহার সম্মুখে ধারণ করিলে ভাল হইত না কি? আমরা পাশ্চত্য জ্ঞান বিজ্ঞান বর্জ্জন করিতে চাহি না—মহাত্মারও তাহা উদ্দেশ্য নহে; তবে, তাহার সময় আছে।

এই সকল কারণে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ভারতে, আপাততঃ, স্থায়ী

প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না। ভারত চায় ত্যাগ। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই ত্যাগের আদর্শ তেমন ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। সুতরাং বাহিরে তাঁহার যতই সমাদর হউক, দেশমধ্যে তিনি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ লাভ করিতে পারেন কিন্তু কখনই বর্ত্তমান জাতীয় যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিবেন না।

সুখের ঘর গড়া

ষোড়শ অধ্যায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

তর্কসিদ্ধান্ত পঞ্চুকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তর্কসিদ্ধান্তের উপস্থিতিতে তর্জ্জন গর্জ্জন যুক্তি বর্ষণ থামিয়া গিয়া ফিস্ ফাস্ কানাকানিতে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণের পট্টবস্ত্র পরিহিত চন্দন চর্চ্চিত দীর্ঘ ঋজ্বায়ত দেহ ও জলদগম্ভীর তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া কাপুরুষের দল একেবারে ভীত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মহেশও একটু চঞ্চল হইল। "ব্যাপার কি হে ইশেন? হয়েছে কি? এত কানাকাণি কথা কিসের?" ইশেন সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। তর্কসিদ্ধান্ত শুনিয়া বলিলেন—

তর্ক। আমি মাণিকের হাত থেকে যজমানি কেড়ে নিতে চাই এই কথাটা তোমরা বল্‌তে চাও?

ই। (মাথা চুলকাইয়া) তা…তা—না—তবে কিনা—তা—তা—তা কথাটা—

তর্ক। দেৎ তোর তো—তো—তো—খুলে বল্‌তো কথাটা কি? ইশেন দাপ্‌ড়ী খাইয়া বেকুব হইয়া গেল, তার তোত্‌লামির তাল এক তালা হইতে তেতালায় চড়িল। কাজেই ব্যক্তব্য এপক্ষে অবক্তব্য ও শ্রোতাপক্ষে অবোদ্ধব্য হইয়া উঠিল। জীবন তখন ইশেনের হইয়া কথার উত্তর দিল—"ও কথা ছেড়ে দাও দাদা, ধরিনি, তবে কিনা বিশেষ আজকের দিনে বাউনের ছেলেকে মুখুজ্যে গিন্নি অপমানটা কল্লেন—

তর্ক। কি অপমান শুনিই না; পঞ্চুকে দিয়ে পূজা করানো তো?

জী। না না তা নয়—উনি বল্লেন কিনা চালকলা কুড়ানো তোমার মত বাউনের ব্যবসা নয় ও ছোট বাউনের কাজ—

তর্ক। ছোট বাউন বলেছেন শুনেছ?

জী। আমি কেন শুনবো মাণিক শুনেছে—

তর্ক। ওঃ মাণিক শুনেছে! কোথা মাণিক?

মাণিক। (দূর হইতে) আজ্ঞে এই যে—

তর্ক। ছেলে না মেয়ে কোলে হে?

মা। আজ্ঞে ছেলে—

তর্ক। ছেলে কোলে করে বলছ মুখুয্যে গিন্নি তোমায় ছোট বাউন বলেছে?

মাণিক মুস্কিলে পড়িয়া আম্‌তা, আম্‌তা করিতে লাগিল।

তর্ক। বোঝা গেছে! সেই মাণিক তো! টোল ছেড়ে গিয়ে তাড়ার ভয়ে খুড়োকে বল্লে তর্কসিদ্ধান্ত তাড়িয়ে দিয়েছে! ওর অভ্যাস আছে বানিয়ে মিথ্যে বলা। তা ছাড়া এক্ষেত্রে মূলে একটু কিছু আছে বইকি, অমনি কি অত জোর ধরে মাণিক? দক্ষদিদি বলে ঠিক শিবের মাথায় চড়লে ঢোঁড়া গরুড়কে দেখে ফোস্ করে—কথা মিথ্যে নয়—

কথা শুনিয়া মাণিক তো নিভিয়া গেল। জীবন অপ্রস্তুত। ইশেন নীরব। নবীন একা সপ্রতিভ ভাবে বলিল বলিইছিতো মাণিক ভুল শুনেছে না হয় ভুল করেছে; বড় ঘরের মেয়ে উনি, ওঁর মুখে বেফাঁস কথা বেরুবে কেন?

তর্কসিদ্ধান্ত বলিলেন 'আমার যদি কিছু ত্রুটী হয়ে থাকে মাণিকের হয়ে পঞ্চুর পুজো করায়, আমায় মাপ করো, কেন ভদ্রলোকের মেয়েকে বিপন্ন করা জীবন ভায়া···বাউনের ঘরে জন্মে:একটু মনুষ্যেত্বের পরিচয় দিও, পরকালটা আর ঝর্ ঝরে করো না—

এই বলিয়া তর্কসিদ্ধান্ত বাড়ীর মধ্যে গেলেন। এবং যজ্ঞেশ্বরীর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—"কাজ কি মা; চেপে গেলেই হতো! মাণিকের আঁচড়ে তর্কসিদ্ধান্তের চামড়ায় ঘা হবে না; সে তো পরের ছেলে; নিজের ঘরের লোকের কামড়েই বড় আমল দিচ্চি না; তুমি এক কাজ করো বাছা, মাণিককে ডেকে দিচ্ছি তার কাছে ঘাট স্বীকার করে দায় উদ্ধার হও আজকের মত।" যজ্ঞেশ্বরী রাজী হইলেন। তর্কসিদ্ধান্ত মাণিককে ডাকিয়া

লইয়া যজ্ঞেশ্বরীর কাছে বোঝা পড়া করাইতে লইয়া গেলেন। মাণিক বাহিরে আসিয়া সমবেত ব্রাহ্মণদের কাছে বলিল মুখুয্যে গিন্নি আমার কাছে মাপ চেয়েছেন আর আমার তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই—"। শুনিয়া উপস্থিত আসন্ন ফলাহার-প্রত্যাশী দ্বিজকুলের হর্ষকাকলীতে সভা মুখর হইয়া উঠিল। হইল না, কেবল মহেশ ইশেন ও জীবন। জীবন রাগিল তার কারণ সভামধ্যে অগ্রজ কর্ত্তৃক এই তিরস্কার। ইশেনের চটীবার মুখ্য কারণ তার তোতলামিকে লক্ষ্য করিয়া তর্কসিদ্ধান্তের দাপড়ী দেওয়া। গৌন কারণ কিছু-দিন পূর্ব্বে তর্কসিদ্ধান্ত তাহাকে চামার বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। হেতু এই প্রতিবেশীর এক গর্ভবতী গাভী ইশেনের শাকের ক্ষেতে অনধিকার প্রবেশ পুর্ব্বক নবজাত পালম শাক গুলি ধ্বংস করে; এবং ইশেন প্রচণ্ড কোপে কুপিত হইয়া অবলা জন্তুকে নৃশংসের মত প্রহার করিতে থাকে; এই ব্যাপার তর্কসিদ্ধান্তের নজরে পড়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "হাঁহে ইশেন তুমি বাউন না চামার?"। মহেশ সন্তুষ্ট নয়, কেন না এত সহজে উভয়কে ছাড়ান দেওয়া হইতেই পারে না, তা ছাড়া তার গভীর উদ্দেশ্য সাধন হয় না। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়...পূজাবেশ বদলাইবার জন্য বাড়ী ফিরিলেন। তিনি ভাবিয়া গেলেন যে মাপ ঘাট স্বীকার করায় সব মিটিয়া যাইবে; কিন্তু মহেশের তাহাতে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়; কাজেই মহেশ সমবেত ব্রাহ্মণদের সম্বোধন করিয়া বলিল—"তোমাদের কি মৎ-তা হলো?" জীবন ও ইশেন মাণিকের সঙ্গে কি একটা কানাকানি পরামর্শ করিল। পরে নবীন বলিল, "কিন্তু একটা কথা—কথাটা তোমার গিয়ে হচ্চে—ভোলানাথ কোথা—সব বিষয়ে স্পষ্টতা ভাল, বিশেষ যখন বন্নশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা নিয়ে কথা—" ভোলানাথ আসিল, পিছনে পিছনে বিজয় আসিল, বিজয় গদ্যময় পল্লী জীবনের কদর্য্য গদ্যময় বিশ্রী ব্যাপার দেখিয়া——ঘৃণায় ও রাগে অবাক হইয়া গিয়াছিল। ভবানী ও তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া এক ধারে অলক্ষ্যে বসিল। সে দেখিল তার পিসে বাবু স্বয়ং মধ্যস্থলে, ভাসুর কোণায় সিংহের মত গোঁপ ফুলাইয়া বসিয়া আছেন। অন্তরঙ্গ ঈশেন, জীবন, নবীন প্রভৃতি পার্শ্বদপরিবেষ্টিত হইয়া......সভা অলংকৃত ও কৃতকৃতার্থ করিতেছেন। পঞ্চু অধৈর্য্য হইয়া বলিল "কথাটা কি নবীন খুড়ো বলে ফ্যালো।" নবীন বলিল,—"কথাটা হচ্চে—ভোলানাথকে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ করে মর্য্যাদায় মূল্য দিতে হবে নচেৎ কোনো কুলীন সন্তান অনাচারের বাড়ীতে অন্ন ছুঁতে পাবে না"। মহেশ—"হ্যাঁ সেটাতো

করবেই কথাই হয়ে আছে মাষ্টার তা জানে। না কিনা মাষ্টার বল?"

ভোলানাথ বলিল— "বলেন যদি তা করতে হবে, করবো কি বলুন—"

ম। করা করি কিহে সামাজিকতার এ অঙ্গ যে?

প। কোন্ অঙ্গ চৌধুরী মহাশয়? (মৃদু হাস্য)

নবীন। বাবাজী মান্য ব্যক্তির কথা গ্রাহ্যনীয় করো—যাগ তার পর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য অবশ্য এটা যোলো আনার মত আমার স্বনিজস্ব কথা বা মত নয় কথাটা—

প। অবশ্য তাতে আর ভ্রান্তমীয় কিছুই নেই, বলে যান—

ন। তর্ক সিদ্ধান্ত মশাই পংক্তি ভোজনে যোগ দিলে মাণিক পংক্তিতে যোগ দেবে না আর মাণিক না বস্‌লে আমরা বস্‌তে পারিনি—কেমন কিনা চৌধুরী মশাই—

ম। দশের মতেই মত! আমারা তো দশের পালনকর্ত্তা দশে চক্রে ভগবান তো-কি বল ঈশেন?

ঈ। শা-শা শাস্ত্রেই আছে "চক্রং চক্রং মহাচক্রং যত্র ভূত ভগবান"

ম। কি বলো ভোলানাথ তুমিই তো কর্ম্মকর্ত্তা?

ভো। আমার মান অপমান দশের হাতে, যা বলবেন যা কর্ত্তব্য তাই করতে হবে—যোলো আনার যদি তাতেই মত—

ম। মত সেই রকমই তো দেখাচ্ছে—হে না ঈশেন?

বিজয় আর স্থির থাকিতে পারিল না, সে উঠিয়া উত্তেজিত—কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল,"কাকা বলচেন কি? কি করে—এই অপমানকর প্রস্তাবে আপনি মত দিচ্ছেন? না আসুন আমি মায়ের মত জেনে আসি ছিঃ ছিঃ—"বলিয়া বিজয় দ্রুত পদে বাড়ীর ভিতর গেল। বেশী দূর যাইতে হইল না যজ্ঞেশ্বরী অন্তরালে দ্বারে কাণ দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—বিজয়কে বলিতে ও হইল না; তিনি ইচ্ছা করিয়াই সভার সকলকে শুনাইবার মতলবে দৃপ্তা সিংহিনীর মত গুরু গম্ভীর উচ্চ স্বরে বলিলেন—"বাবা বিজু সভায় এই কথা আমার নাম করে বল তো চৌধুরী মশাইকে-শুদ্ধমাত্র এক সিংহের মান রাখবার জন্যেই হাজার শেয়ালকে তুচ্ছ জ্ঞান করা যায়? চাইনি আমি কাকেও এ বাড়ীতে।"

কথা গুলি সকলেই শুনিল; নারী কণ্ঠ হইতে এই অপ্রত্যাশিত বজ্র-কঠোর সুচি-তীক্ষ্ণ কথা শুনিয়া সমস্ত সভা নীরব নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ।

পঞ্চু বুঝিল ইহার ফলাফল কতদূর গড়াইবে। সে এই মহিমময়ী নারীর

ঔদার্য্যে মহত্ত্ব ও তেজ দেখিয়া সভ্রমে পুলকিততনু হইলেও পরিণাম ফল ভাবিয়া ভীত হইয়া ছুটিয়া মামাকে গিয়া খপর দিতে গেল। মহেশ আকাশ হইতে পড়িয়া যাইবারও বাড়া হইল। সে নতশির হতসর্ব্ব, গুম হইয়া বসিয়া রহিল। ভবানী এতক্ষণ চুপ করিয়া কাণ্ড দেখিতেছিলেন; মহেশের এই যে প্রাণপণ চেষ্টা একজন যথার্থ গুণীমানী সাধু পণ্ডিত ব্যক্তিকে অপদস্থ করা ও এক দেবীতুল্যা অসহায়া বিধবা নারীরত্নকে গ্রামের মধ্যে নির্য্যাতনের পাত্রী করিয়া রাখা ইহার দৃশ্য ও চিন্তা তাহার মহৎ প্রাণকে যার পর নাই ব্যথা দিতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা তার বেদনা ও লজ্জার কারণ এই যে ওই স্বার্থপর নীচ হীনমনা গুরু স্থানীয় আত্মীয়টী তাহাদের বংশের ও ঘরের নামের উপর দুরপনেয় কলঙ্ক পঙ্ক মাখাইতেছে। তার পর সেই দর্পিত স্পর্দ্ধা যখন ওই দরিদ্র অবলা মহীয়সী নারীর পায়ের ঈষৎ টীপনীতে নত হইয়া মাটীতে মিশাইল তখন তাঁহার হৃদয় ভক্তিআনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া বলিলেন "আমার বন্ধু বিজয় বাবুর মাতাঠাকুরাণী যা বল্লেন তা আপনারা শুনলেন তো আজ তিনি তাঁর যে পায়ের কড়ে আঙ্গুলের চাপে আমাদের মত জমিদারের পাশব স্পর্দ্ধার জঘন্য তেজকে ভেঙ্গে দিলেন সেই পায়ে আমার কোটী নমস্কার। কেবল আমার লজ্জা এই যে আমার এই ঘৃণিত আত্মীয়টীর মাথায় ঠেকাতে তাঁর পা অপবিত্র হয়েছে কিন্তু আনন্দ এই যে, যে মর্য্যাদার জন্যে উনি নগদ যৎকিঞ্চিৎ মূল্যের প্রস্তাব করছিলেন এই দেবীর পাদস্পর্শে তাঁদের মর্য্যাদা লক্ষগুণ বেড়ে গেল।"

ভবানী চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সমস্ত সভা একেবারে নির্ব্বাক। প্রথমতঃ ভবানীকে এ বাড়ীতে আজকের দিন এই সভাতে দেখিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ তার মুখে আজ এইরূপ মর্ম্মান্তিক শ্লেষতিক্ত অপমান বাণী শুনিয়া বিশেষ এই শত্রু পুরীতে ভয় সম্ভ্রমে অভ্যস্ত অধীন প্রজাদের সুমুখে ছেলের বয়সী শ্যালক পুত্রের মুখ হইতে শুনিয়া মহেশ মৃতের মত অসাড় ও বিবর্ণ হইল; তবে জমীদারী সেরেস্তার নায়েবী ম্যানেজারী করার চামড়া, বিশেষ বেশীক্ষণ সে ভাব রহিল না, বরঞ্চ সামলাইয়া উঠিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া গুরুজন ভাব ফলাইয়া বলিল "বাবাজী সব যায়গাতেই কি আমাদের কাজে কর্ম্মে কথায় টেক্কা দিতে হবে? যখন জমীদারী পেয়ে গদি দখল করবে তখন তোমার নুন খেয়ে গোলামি করিতো তখন দু কথা বলো, দু ঘা মারো সইব; এখন না —তোমার খুড়োর চাকর আমি তোমার নয় বাবাজী, এখন হতেই মারতে

যেও না বাবাজী, বাঘ কি বেরাল ঠিক হোগ আগে—"। ভবানী কি বলিতে যাইতেছিল। মহেশ বাধা দিয়া বলিল—"থাক্ আর শুনতে চাইনি রায় মশাই। এর কাছে এর উত্তর শুনচো। সেখানেই জবাব দিহি হবে—"। বলিয়া মহেশ উঠিল; অন্তরঙ্গ দু এক জন পার্শ্বদ ও উঠিল। মহেশ স্থান ত্যাগ করিল। ঈশেন, জীবন নবীন ও জয়রাম ও তাহাই করিল। এমন সময় পঞ্চু ও আগে আগে তর্ক সিদ্ধান্ত আসিয়া উপস্থিত। তর্ক সিদ্ধান্ত দেখেন ব্রাহ্মণরা উঠিয়াছে, এ ওঠা ফলার ভোজনের জন্ম গা তোলা যে নয় তা তিনি পঞ্চুর মুখে পূর্ব্ববৃত্তান্ত শুনিয়া আন্দাজ করিলেন। তিনি নিজের মানাপমান ভুলিয়া যজ্ঞেশ্বরীর ম্যান অপমানের চিন্তায় ব্যস্ত হইলেন। অসন্তুষ্ট সমবেত ব্রাহ্মনদের বসিতে বলিয়া দলপতিদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন— "চৌধুরী মশাই—শুনুন আমার কথা, আমি না খেলে আর আমার বাড়ীর যারা তারা না খেতে এলে যদি মাণিক এবং আপনারা খেতে বসেন তাতেই আমি রাজী আছি; আমি বলছি আমরা চল্লাম আপনারা খোলসা মনে মর্য্যাদা বাঁচিয়ে ব্রাহ্মণকন্যার মর্য্যাদামান রাখুন! তবে মর্য্যাদার মূল্য স্বরূপ ভোলানাথের কাছে শুনছি বাউন পিছু পাঁচ টাকা করে চাওয়া হয়েছে। এমন গুরুতর শাস্তি বিধানের মানেটা কি? জন পঞ্চাশ বাউন এসেছেন তাঁদের সবাইকে মর্য্যাদা দিতে গেলে গরীব যে মারা যাবে? আমার মতে নাম মাত্র একটা পরিমাণ ধরে নিন, ধরুন আট আনা কি চার আনা!"

জয়রাম। (বিদ্রূপ স্বরে) কুলিনের ছেলের মর্য্যাদা অত সস্তা নয়—আপনার তাতে সন্তোষ হতে পারে।

ভবানীর অসহ্য হইল, বার বার এই পুজনীয় সর্ব্বজননম্য পণ্ডিত ব্রাহ্মণের অপমান এই সব লোকের হাতে এ দৃশ্য তাঁর অসহ্য হইল। তিনি রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—"এক পয়সা মর্য্যাদা নয়, খেতে হয় খেয়ে যাগ সব, ভদ্রতা করে উনি নেমন্তন্ন করেছেন ওঁর মাতৃ পিতৃ দায় নয়, ভদ্রতা বোধ যদি থাকে খেয়ে যাও বসে সব। ব্যবদাদারীর প্রশ্রয় দেবেন না জ্যাটা মশাই।" তর্ক সিদ্ধান্তের অন্য চিন্তা গেল, ভবানীর মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন—'ওই বাড়ীতে ওই সংস্কার আচার ব্যবহারের মধ্যে বাড়িয়া বাঁচিয়া এমন ছেলে কেমন করিয়া হইল! তাঁহার একটা পণ্ডিতীসুলভ ধারণা ছিল ভবানী ও খুড়ার মত না হইয়া যায় না। ভবানী সিদ্ধান্তকে নিরুত্তর দেখিয়া বিজয় ও পঞ্চুর "দিকে তাকাইয়া বলিল,—"আপনারা কি বলেন?" উভয়েই চট করিয়া উত্তর দিল

"ঠিক ওই বলি।" বিজয় আরও বলিল মর্য্যাদাটা কেন বুঝিলাম না! পঞ্চু বলিল "হাঁা, ওরা এঁর বাড়ী পাত পেতে এঁর সাতকুলকে কৃতার্থ করছেন আর ওঁদের এই বাড়ীর লুচি মণ্ডা খেয়ে সুতৃপ্ত ও উদর পুরিত হলেও সনাতন বংশ ধর্ম্ম ও কুল মর্য্যাদা কলুষিত হয়ে উঠ্‌লো কাজেই কিঞ্চিৎ কাঞ্চণ দিয়ে ধর্ম্মটাকে ঘসে দিলে ওটা আবার সনাতন জ্যোতিতে ফুটে উঠ্‌বে! পরলোকের পথের কাঁটা উপড়ে যাবে—সোজা কথাটা—"

তর্কসিদ্ধান্ত অভ্যাগত নিমন্ত্রিতরা হাঁ না কিছুই বলে না দেখিয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন। নবীন ফিরিয়া আসিয়া দু এক জনের কানে কানে কি বলিল। সকলেরই দেখা গেল একটা ভাবান্তর হইল। অনিচ্ছা সত্বে একে একে সকলে উঠিল। যাহারা ছিল তাহারা অনেক লোভেই বসিয়াছিল; মহেশের কোপ-কুটীল ভ্রুকুটীতে ও ফলাহারের মায়া ত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রথম সঙ্গে যে ছেলে পুলে গুলা ছিল তাহারা অভুক্ত, ক্ষুধায় কাতর বাড়ী গেলেও কিছু খাবার পাইবে না; দ্বিতীয় বাড়ীর মেয়েরা তাঁদার অপেক্ষায় হাঁ করিয়া বসিয়া আছে, তৃতীয় মর্য্যাদার দরুন পাঁচ পাঁচ টাকা পাইবার আশা ছিল। কাহারো কাহারো পক্ষে মাসের রোজগার! চতুর্থতঃ দক্ষিণা এক আধুলি। পঞ্চমতঃ মধ্যাহ্নের উদরপুত্তির ফলে রাত্রির অন্নব্যয় নিবারণ! কিন্তু নবীন যে খপর আনিয়াছিল তা সাতিশয় ভয়াবহ; আর থাকা চলে না। সকলে মন ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল; ছেলেগুলা ভাবিল ফলাহারের ডাক্! বেচারাম ব্যাচারীর কি সে দুঃখ, ছেলেগুলা বাড়ী যাইতে হইবে শুনিয়া উঠিতে চায় না। দুঃখ দেখিয়া ভবানী ও পঞ্চু ভারি দুঃখিত হইল। ভবানী বলিল আপনারা তা হলে খেতে বসবেন না? বেচারাম বলিল "না হুজুর, চৌধুরী মশাই এর আজ্ঞে লংঘন কি করে করি বলুন হাজার হোগ তাঁর আশ্রয়ে বাসতো!

ভ। তিনি কি বলেছেন?

বে। (এ দিক ও দিক তাকাইয়া) আজ্ঞে বাবু না কি বলে পাঠিয়েছেন যে এ বাড়ী পাত পাতবে তার—

ভ। তার কি বলুন না?

বে। বাবা তুমি ও রাজা তিনি ও রাজা! নাই বা বলি কি করে—আমার যে বাবা—না যাইলে রাজা বধে যাইলে মারীচ—করি কি বাবা।

ভ। বলুন আপনি ভয় নেই

পঞ্চু। বল না বেচা খুড়ো ভয় কি ওনিই তো দু দিন পরে তোমাদের—

বে। হ্যাঁ বাবা রাজা হবেন বাঁচিয়ে রাখুন ভগবান—আমরা কি তদ্দিন—কথাটা কি বাবা তিনি হলেন ম্যানেজার হর্ত্তা কর্ত্তাই বটে, তা যদি এক দিনের খুচির লোভে ভিটে লোপ পায় থাক্ বাবা তোমাদের কল্যেণে অনেক জুটবে—

ভবানী সকলকে ডাক দিয়া বলিলেন—"আপনারা চলুন কোনো ভয় নেই আমি ভরসা দিচ্ছি।" ভরসা পাইবার আগেই জনকতক চলিয়া গিয়াছে। বাকী ছিল জন দশ, ছেলে পুলে লইয়া জন ২৫।২৬। নবীন তাহাদেরও ভাংচি দিতে লাগিল। ভবানীর একটা তীক্ষ্ণ চাহনিতে ভয় পাইয়া সে নিজে সরিয়া পড়িল।

প্রথম সত্বে রাজি তর্কসিদ্ধান্ত ভোলানাথকে সবান্ধব মহেশকে ফিরাইতে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ভয়ে ভাবনায় বিরক্তি ও ক্লান্তিতে তিক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিল। (ক্রমশঃ)

তামিল সাহিত্য

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ]

বিন্ধ্য পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক অগস্ত্য ঋষি দক্ষিণ যাত্রা করিয়া সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে যতই মতবাদ হউক না কেন, তিনি যে আর প্রত্যাগমন করেন নাই তাহা আমাদের 'অগস্ত্য যাত্রা' কথাটীতেই সপ্রমাণ। আকাশ মার্গে বিন্ধ্যপর্ব্বতের গতিবিধি নিবারণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল কিনা সে কথা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। তবে এটা খাটি সত্য যে অভ্রভেদী পর্ব্বত তিনি অতিক্রম করার পর হইতে সেই পথে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দক্ষিণাত্যে মনুষ্যের চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। অর্থাৎ রূপকের অর্থে বিন্ধ্য পর্ব্বতের উঁচু মাথা নীচু হইয়াছে। আমাদের পুরাণের কথার বোধ হয় এই অংশ টুকু বিনা বিসংবাদে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তৎপূর্ব্বে বিন্ধ্যপর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল কিনা এবং অগস্ত্য ঋষি সেই সমুদ্র শোষণ করিয়া সমুদ্রগর্ভকে দেশে পরিণত করিয়াছিলেন কিনা সে আলোচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে পড়িয়াছে। সুতরাং আমাদের সে বিষয়ে নিরস্ত থাকাই শ্রেয়ঃ।

তামিল সাহিত্যের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে অগস্ত্য ঋষি সদল বলে তামিল ভাষা ভাষী অন-আর্য্যগণের মধ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাহাদিগের শিক্ষা দীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্রাবিড়ী ভাষা সমূহের মধ্যে

তামিল ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং তামিল সাহিত্যই সমধিক সম্পন্ন। এই সাহিত্যে অগস্ত্য ঋষির প্রভাব এত অধিক যে প্রাচীন কালে তামিল গ্রন্থকার মাত্রেই স্ব স্ব রচনা অগস্ত্য ঋষির নামে চালাইয়া দিয়া আত্ম গোপন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি বোধ করিতেন। যে কোন ও গ্রন্থকার যাহা কিছু লিখুন না কেন সেইটাই অগস্ত্য ঋষির রচনা বলিয়া তিনি প্রচার করিতেন এবং অতি সাবধানে নিজের নাম গোপন করিতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কবি কালি দাসের স্কন্ধে ও এই প্রকার বহু রচনা ন্যস্ত করা হইয়াছে। তাই অন্য রস-রসিক কবির নাম জ্যোতিষ নীতি শাস্ত্র, প্রাকৃত সাহিত্য প্রভৃতি অসংখ্য স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তামিল সাহিত্যে অগস্ত্য ঋষি কোন :ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহা এক্ষণে জানিবার কোন ও উপায় নাই। কিন্তু তামিলভাষা ভাষিগণের অসংখ্য রচনাই তাঁহার নামে পরিচিত। প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে তিনি তামিল ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, তিনিই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রচারক, তিনিই রসায়ন (chemistry or alchymy) শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, তিনিই ইন্দ্রজাল বিদ্যার আবিষ্কারক, ভাস্কর্য্য ও স্থপতি শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই জ্যোতিষ শাস্ত্র ও ব্যবহার শাস্ত্রের রচয়িতা, এবং তিনিই তামিল বর্ণমালার উদ্ভাবন কর্ত্তা। এই সকল অসংখ্য বিষয়ে তিনি নাকি তামিল ভাষাভাষিগণের জন্য অর্দ্ধ শতাধিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে বর্ত্তমান কালে এই সকল গ্রন্থ বা শাস্ত্রগ্রন্থের কিছুই অবশিষ্ট নাই। কেবল মাত্র তদ্‌রচিত ব্যাকরণের অংশ বিশেষ এখন ও বর্ত্তমান আছে বলিয়া তামিলভাষিগণ:নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান তামিল ভাষা সে ব্যাকরণের আইন মানে না। কারণ সেটা প্রাচীন ভাষার ব্যাকরণ।

অগস্ত্য ঋষির এক জন সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন; তাঁহার নাম এক্ষণে অবিদিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "তোল-কাপ্পিয়ম্" ; এবং গ্রন্থের নাম হইতে তাহা হইয়াছে "তোল-কাপ্পিয়নার্" 'তোল্' শব্দের অর্থ 'প্রাচীন' এবং কাপ্পিয়ম্" কাব্য ; সুতরাং গ্রন্থখানির নামের অর্থ প্রাচীন কাব্য। গ্রন্থখানি কিন্তু কাব্য গ্রন্থ নহে.। গ্রন্থ খানি ব্যাকরণ শাস্ত্র; অলঙ্কার শাস্ত্র ও বলা যাইতে পারে, কারণ কাব্যের লক্ষণ ও কাব্য প্রণয়নের রীতি ও পদ্ধতি এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। কথিত আছে "তোল কাপ্পিয়নার" তাঁহার ব্যাকরণে অগস্ত্য প্রণীত ব্যাকরণের সারাংশ গ্রহণ করিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন, তবে তিনি বিদ্যাসাগরের গোপাল নামক সুবোধ বালকের ন্যায় শিষ্য ছিলেন

না ; তিনি স্নয়্শার্ শিষ্য ক্রগ্মানের ন্যায় গুরুদ্রোহী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাই তিনি অগস্ত্যের ভাষা বিজ্ঞানের কঠোর সমালোচনা করিয়া আত্মমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার গ্রন্থে কাব্যরচনা উদাহরণ স্বরূপ অসংখ্য প্রাচীন কাব্যের উদাহরণ আছে। সংস্কৃত কাব্যাদর্শ সাহিত্যদর্পনে যেমন উদাহরণ স্বরূপ বহু প্রাচীন কবির রচনার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায় এই গ্রন্থে ও সেই প্রকার আছে। সুতরাং প্রাচীন তামিল সাহিত্যের কোন ও উদাহরণ দেখিতে হইলে এই গ্রন্থে তাহার সন্ধান করিতে হইবে। এই হিসাবে এই গ্রন্থ খানি তামিল সাহিত্যের একটী মূল্যবান রত্ন। তামিলগণ বলেন যে এই গ্রন্থ অতি প্রাচীন। কিন্তু এই গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্ব্বে যে বহু তামিল সাহিত্যে গ্রন্থ ছিল এবং বহু বৈয়াকরণ যে ইহার পূর্ব্বে তামিল ভাষাও তামিল কাব্যের আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার এই গ্রন্থ হইতেই সুপরিস্ফুট। ইহার গ্রন্থে যে কেবল প্রাচীনকাব্য ও প্রাচীন সাহিত্যের আদর্শ ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্র বুঝাইবার জন্ত উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা নহে। ইনি বহু প্রাচীন ব্যাকরণগ্রন্থ, কাব্যগ্রন্থ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের সমালোচনা করিয়াছেন এবং বহু প্রাচীন মত গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা ভাষায় প্রচলিত দেখিয়াছেন তাহাই ব্যাকরণের বিধি বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি কোথাও সংস্কৃত বৈয়াকরণ: পাণিনির ন্যায় ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত তাহা লইয়া মাথা ঘামান নাই। প্রাচীন শাস্ত্রকার ও কবিগণের মত পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ ‘এন্মনার পুলবর্’ (=কবি বলেন, বা বৈয়াকরণ বলেন) এই বাক্যটী দৃষ্ট হয়। ইহার গ্রন্থেই যে সকল লুপ্ত তামিল গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূলান্বেষণ করিতে যাইলে অনৈতিহাসিক অন্ধকার যুগে আসিয়া পৌঁছিতে হয়। সুতরাং ইহার পূর্ব্বে যে সাহিত্য ছিল, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করা এক্ষণে একপ্রকার অসম্ভব। সেই জন্ত ‘তোল্কাপ্পিয়ম’ গ্রন্থকেই তামিল সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলা যায়।

দুঃখের বিষয় ইনি কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের ন্যায় তামিল সাহিত্যিকগণও আত্ম-স্মৃতি লোপ করিবার জন্যই সযত্ন ছিলেন। জাতীয় সাহিত্যের স্রোতের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাকে ভাসাইয়া দিয়াই কবিগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। কত কবিই যে স্ব স্ব রচনাকে ঋষি অগস্ত্যের নামে বিলাইয়া দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তামিল জাতিও সাহিত্য হইতে

শিক্ষালাভ করিয়াছেন, সাহিত্যের সমাদর করিয়াছেন, স্মৃতিমধ্যে প্রাচীন সাহিত্য গাঁথিয়া রাখিয়াছেন, সৎসাহিত্য ও অসৎসাহিত্যের সমালোচনা করিয়াছেন; কিন্তু কে কোন্ গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন, কোন্‌খানি প্রাচীন, কোন্‌খানি অর্ব্বাচীন, কোনও গ্রন্থের রচয়িতা আছে কি না আছে তাহার বিচার লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। ঐতিহাসিক আলোচনা বা সমালোচনা প্রবৃত্তি অতি আধুনিক যুগে ইউরোপীয়গণের নিকট পাইয়াছেন। তৎপূর্ব্বে এ প্রবৃত্তি তাঁহাদের ছিল না।

"ঞানন্ঢু' বা জ্ঞানশতক নামক একখানি আধুনিক নীতিশাস্ত্রমূলক কবিতা গ্রন্থ মহর্ষি অগস্ত্যের নামে প্রচলিত। কিন্তু ইউরোপীয়গণ ইহার মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পান। গ্রন্থখানি তামিল হিন্দু ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সমাধিক সমাদৃত। কারণ ইহার উপদেশে কোনও ধর্ম্মবিশেষের প্রতি কোনও আস্থা প্রদর্শিত হয় নাই। ইহার উপদেশ সর্ব্বধর্ম্মের উপাসকগণের নিকট সমানভাবে সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষায় ইহার অনুবাদ বাঞ্ছনীয়। আমাদের আধুনিক কবি শ্রীযুক্ত ক্যলিদাস রায়কে এবিষয়ের জন্য কোমর বাধিতে অনুরোধ করি। এই গ্রন্থের একটী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল। Caldwell এই কবিতার মধ্যে নামহীন খ্রীষ্টধর্ম্মের উপদেশের উপলব্ধি করিয়াছেন।

Worship thou the Light of the Universe ; who is one ;
who made the world in a moment, and placed good men in it ;
who afterwards himself dawned upou the earth as Guru.
who without wife or family, as a hermit performed austerities,
who, appointing loving sages (Siddhas) to succeed him,
Departed again into heaven—worship him.

খ্রীষ্টীয় অষ্টমশতক হইতে দ্বাদশশতক পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে জৈনগণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ইহাঁদের প্রভাবে পাণ্ড্য বা তামিলদেশে চারিশতাধিক কাল সাহিত্যসেবা চলিয়াছিল। নালন্দার বিহার বা বিশ্ববিস্থালয়ে যেরূপ বহুকাল বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ সাহিত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিয়াছিল, তিব্বত ও চীন প্রভৃতি দূরদেশ হইতে অসংখ্য বৌদ্ধধর্ম্মী ধর্ম্মপিপাসু যেরূপ ধর্ম্মালোচনার জন্য নালান্দার বিশ্ববিস্থালয়ে গতায়াত করিয়াছিলেন, প্রাচীনকালে মহুরা (মধুবা বা মথুরা শব্দ সমার্থক) সহরে সেইপ্রকার একটী জৈন বিশ্ববিস্থালয়

স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু নালন্দার ন্যায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরূপ প্রতিষ্ঠা বা সমাদর হয় নাই। এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু তামিল কাব্য ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং জৈন সাহিত্যের আলোচনার জন্য তামিল সাহিত্যের এই সকল গ্রন্থের উদ্ধার সাধন ও প্রচার আবশ্যক। জৈনগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-বিরোধী হইলেও তাঁহাদের সভ্যতা ও তাঁহাদের সাহিত্য ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতা ও সংস্কৃত্য সাহিত্যের নিকট ঋণী। জৈন তামিল সাহিত্য সাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়া স্বরূপ হইলেও একটা বিষয়ে তামিল সাহিত্য মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছে। সেটা তামিল নীতি সাহিত্য। নীতি-উপদেশ-মূলক যেসকল তামিল কাব্য প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে অনুকরণ অপেক্ষা মৌলি-কতার ভাগ এত অধিক যে অনেক তামিল-সাহিত্যবিৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে এই বিষয়ে তামিল সাহিত্যই সংস্কৃত সাহিত্য অপেক্ষা সম্পন্ন।

তিরুবল্লুবর্ প্রণীত কুড়াল্ একখানি নীতিশাস্ত্র বা পুরুষার্থ বিষয়ক সুপ্রতিষ্ঠিত তামিল কাব্য গ্রন্থ। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ বিষয়ে ১৩৩০ পঙক্তি কবিতায় রচিত সূত্র আছে। এখানি অতি উপাদেয় এবং প্রাচীন : তামিল কাব্য বলিয়া সমাদৃত। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ তামিল সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই। জৈনধর্ম্মের মূলমন্ত্র "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এবং "সর্ব্ব জীবে সম দয়া" এই গ্রন্থেরও মূল মন্ত্র। ইহাতে সাঙ্খ্য-দর্শনের ব্যাখ্যা আছে; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যে প্রচারিত বেদান্তদর্শনের কোনও প্রভাব নাই। শৈবধর্ম্মের তান্ত্রিকতা বা বৈষ্ণবধর্ম্মের ভক্তিবাদ ইহাতে নাই। প্রাচীন ব্যাকরণ ও ছন্দোগ্রন্থাদিতে ইহার বহু কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ বা বেদান্তাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের দেশব্যাপী প্রভাব এই গ্রন্থে লক্ষিত হয়না বলিয়া তামিলভাষাবিৎ ইউরোপীয়পণ্ডিতগণ ইহাকে অতি প্রাচীন তামিল কাব্য বলিয়া মনে করেন। এবং Caldwell বলেন খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পূর্ব্বেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহার রচনাকাল বিষয়ে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই।

কুড়াল্ গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা তিরুবল্লুবর্ হীন কুলোদ্ভব, 'পড়েইয়' বংশোদ্ভূত। এই জন্য মদুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আভিজাত্যাভিমানী পরিচালকগণের নিকট প্রথমে ইহার সমাদর হয় নাই। কিন্তু তাহার ফলে মদুরা বিশ্ববিদ্যালয় রাজাদেশে বিলুপ্ত হয় দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি নক্কীরর্ এই গ্রন্থখানিকে মদুরা কলেজের অষ্টাদশ

কাব্যগ্রন্থের অন্তিম কাব্যগ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ এঅপমান সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। ইহার পরেই মদুরা কলেজ স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

তিরুবল্লুররের প্রকৃত নাম জানা যায় নাই। 'বল্লুবন্' শব্দের অর্থ 'পঢ়েইয়' পুরোহিত। তিরুবল্লুবস্ (শ্রীবল্লুবন্) শব্দে ঋষি স্থানীয় পঢ়েইয় পুরোহিত বুঝায়। তাঁহার জন্ম বিষয়ে দুইটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রথমটী অনুসারে তিনি পঢ়েইয় কুলোদ্ভূত। দ্বিতীয়টী অনুসারে তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসে পঢ়েইয় মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য ভগিনী অউবেইয়ার্ এর নামে বহু প্রাচীন করিতা প্রচলিত আছে। কথিত আছে ইনিও একখানি প্রাচীন কবিতা গ্রন্থের রচনা করিয়া ছিলেন। তাহা এক্ষণে লুপ্ত। তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় তাঁহারও প্রকৃত নাম জানা যায় নাই। তামিল ভাষায় অউবেই বা অউবেয়ার্ শব্দে 'মাতা' বা 'মাতৃস্থানীয়া পূজনীয়া মহিলা' বুঝায়।

'নালড়িয়ার্' আর একখানি প্রাচীন কবিতা গ্রন্থ। ইহার ছন্দোরূপে চতুষ্পদী বৃত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'নালড়িয়ার' বা চতুষ্পদী। ইহারও গ্রন্থকারের বিষয় কিছুই জানা যায় নাই। এখানিও মদুরাবিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টাদশ কাব্যগ্রন্থের অন্যতম। ইহার রচনায় বিচার ও অলঙ্কারের বাহুল্য আছে বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে কুড়াল্ অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহারও প্রতিপাদ্য বিষয় "ত্রিবিধ পুরুষার্থ" বা 'ধর্ম্ম, অর্থ, কাম'।

'চিন্তামণি' একখানি অতি প্রাচীন জৈন সম্প্রদায় রচিত তামিল মহাকাব্য। ইহাতে ১৫০০০ চরণ বা কবিতার পঙ্ক্তি আছে। ইহারও প্রণয়িতার বিবরণ নাই। ইহার রচনার রীতি অতি উৎকৃষ্ট হইলেও তামিলগণের মধ্যে যথোচিত চর্চ্চা হয় নাই। অথচ যাঁহারা ইহা পড়িয়াছেন তাঁহারা ইহাকে কুড়াল্ অপেক্ষা প্রাচীন বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। ইহারই অনুকরণে ইটালী দেশীয় 'বেশ্চি' নামক জনৈক তামিল কবি 'তেম্বাবণি' নামক একখানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি চিন্তামণির অনামা রচয়িতাকে 'তামিল কবির সম্রাট্' বলিয়াছেন।

জৈনগণ বহু কোষ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচীন তামিল ভাষার একখানি অভিধান 'দিবাকরম্'। অভিধান খানির রচয়িতা 'শেন্দনার্' নামক মদুরা কলেজের জনৈক সভ্য। 'পিঙ্গলন্দেই' ও 'চূড়ামণি নির্ঘণ্ট' আর দুইখানি জৈনরচিত অভিধান। দ্বিতীয়খানির রচয়িতা 'মণ্ডল পুরুষ' নামক একজন

জৈন খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের লোক। 'পবণন্তি' নামক আর একজন জৈন 'নন্নূল্' নামক বিখ্যাত তামিল ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের এই খানিই প্রামাণিক ব্যাকরণ।*

তামিল রামায়ণ একখানি উপাদেয় মহাকাব্য। ইহার রচয়িতা 'কম্বর' রাজা রাজেন্দ্র চোলের রাজত্ব কালে জীবিত ছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণ ও তামিল রামায়ণে যে সম্পর্ক তাহাতে কম্বরের মহাকাব্যকে বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ না বলিয়া বাল্মীকির আদর্শে বা বাল্মীকির উপাখ্যানমাত্র লইয়া রচিত কাদম্বরীর ন্যায় পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ একখানি মহাকাব্য বলা যায়। বাল্মীকির রচনার স্থানবিশেষে অলঙ্কারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আড়ম্বর আছে, স্থানবিশেষে স্বাভাবিক কবিনৈপুণ্যের চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়, স্থানবিশেষে ভাষা শোক দুঃখাদি করুণ ভাবের আবেগে পূর্ণ, স্থানবিশেষে আনন্দের উচ্ছ্বাসে বর্ণনা মুখরোচক, স্থানবিশেষে কবি নিতান্তই গম্ভরসাত্মক আবার স্থানবিশেষে অন্যরূপ। কিন্তু কম্বরের রামায়ণের ভাষা মাজা ঘষা, ঝর্‌ঝরে তর্‌তরে, সর্ব্বত্রই পাণ্ডিত্বের পূর্ণ বিকাশ, অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, ছন্দোজ্ঞানের চরম নিদর্শন। বাল্মীকির রামায়ণ স্বাভাবিক কাব্য, কম্বরের রামায়ণ সর্ব্বত্রই পাণ্ডিত্বের কৃত্রিমতাপূর্ণ। বাল্মীকির কাব্য যেন স্বাভাবিক বনভূমি, মুনিগণের তপোবন এখানে কোথাও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অকৃত্রিম বিকাশ ও নানাবিধ বন্য কুসুমের স্বাভাবিক সৌরভ বিকিরণ, কোথাও ভূমি সমতল ও তৃণাচ্ছাদিত, কোথাও বন্ধুর ও উচ্চ নিম্ন। কম্বরের রামায়ণ যেন সযত্ন রক্ষিত কৃত্রিম পার্ক্; এখানে সর্ব্বত্রই সমতল ভূমি, কোথাও বন্ধুরতা বা উচ্চ-নিম্নতা নাই; সমস্ত পার্কটাই সমভাবে কর্ত্তিত তৃণাচ্ছাদিত, এ তৃণের সর্ব্বত্রই সমভাবে ঘন. ও সর্ব্বত্র সমান উচ্চতা; যেন একখানি সুবিস্তীর্ণ কৃত্রিম তৃণনির্ম্মিত বহুমূল্য আসন। এক কথায় সংস্কৃত রামায়ণ যেমন স্বাভাবিকতার নিপুণ নিদর্শন, তামিল রামায়ণ সেইরূপ কৃত্রিমতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আদর্শ।

---

* তামিল সাহিত্যের সহিত জৈনধর্ম্মিগণের এসম্পর্ক জানিলে প্রাকৃত ভাষায় মূর্দ্ধণ্য ণ কারের প্রাদুর্ভাবের অন্য কারণ নির্ণয়ের প্রবৃত্তি, কমিয়া যাইবার কথা। অতি প্রাচীনকালে অগস্ত্য ঋষির যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যে প্রভাব তামিল প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার ফলে সে দেশের হিন্দু ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মিগণ সেকালে এদেশের সহিত পরিচিত হয়েন নাই। তাই খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে মীমাংসা দর্শনের শবর ভাষ্যের টীকাকার কুমারিল ভট্ট আন্ধ্র দ্রাবিড় ভাষাকে ম্লেচ্ছ ভাষা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কম্বরের রামায়ণ রচনার বিষয়ে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তাঞ্জোর অঞ্চলে কম্বনাড়ু নামক স্থানে জন্ম বলিয়া তিনি 'কম্বর্' আখ্যায় অভিহিত। কম্বর্ তাঁহার প্রকৃত নাম নহে। কবি বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি বিস্তৃত হইলে রাজা রাজেন্দ্র চোল তাঁহাকে রাজ সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া বহু সম্মানের সহিত 'কবিরাজ' আখ্যায় ভূষিত করেন। তখন রামায়ণ রচিত হয় নাই। রামায়ণ রচনার জন্য বহু তামিল কবির প্রতিযোগিতা আহূত হয়, এবং রাজেন্দ্র চোলের পুত্র রাজা কুলোতুঙ্গ চোলের সভায় বহু রামায়ণ পঠিত হয়। তন্মধ্যে কম্বরের রামায়ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পুরস্কৃত হয়। ইহার 'এর্ এড়ুবাই' বা হল প্রশস্তি নামক সপ্ততি শ্লোকাত্মক একখানি কাব্য আছে। আরও অনেক ক্ষুদ্র কাব্য ইহার নামে প্রচলিত।

রাজা রাজেন্দ্র চোল পাণ্ড্য-চোল-কলিঙ্গ রাজ্যের সুপ্রতিষ্টিত অধীশ্বর ছিলেন এবং ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন। ১০৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিঙ্গাধিপতি আহ্ব মল্লকে পরাভূত করেন। সুতরাং কম্বরের কাব্য দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বিরচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

এইকালে আরও অনেক কবি ছিলেন। তন্মধ্যে তিরুবল্লুবরের ভগিনী অউবেইয়ার্ একখানি বিশাল সংগ্রহ গ্রন্থের প্রচার করেন। এই গ্রন্থের নাম 'মুদুরেই' বা প্রবাদের জ্ঞান। এই গ্রন্থে একটী কবিতায় আছে :—

"বন্য ময়ূরকে নৃত্য করিতে দেখিয়া 'বান্ কোড়ি' পক্ষী যেমন আপনাকে ময়ুর মনে করিয়া তাহার কদর্য্য পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক নাচিতে আরম্ভ করে মূঢ় কবির কাব্য সেই প্রকার।"

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই 'বান্ কোড়ি' শব্দের অর্থ করিয়াছেন American turkey তাই tobacco potato প্রভৃতি শব্দের ন্যায় এই পক্ষীটিও আমেরিকা হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। এজন্য তাঁহাদের মতে এই গ্রন্থখানি অতি আধুনিক। *

তামিল শৈব সাহিত্যের দুই ধারা। প্রথম ধারার প্রধান গ্রন্থ 'মাণিক্ক বাশগর্' (মাণিক্য-বাচক) বিরচিত 'তিরু বাশগম্' (শ্রীবাচক)। তামিলগণের মধ্যে এই গ্রন্থের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় শৈব সিদ্ধান্ত বা শৈবদিগের দর্শনও ধর্ম্মতত্ত্ব। সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধগণকে (ইঁহাদের

* তামিল ভাষায় 'বান্‌কোডি' শব্দের অর্থ 'বড় পাখী' আমাদের 'পান্‌কোডি' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি?

বিচারে বৌদ্ধগণ বিধর্ম্মী বা heretic) তর্ক যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মাণিক্ক বাশগরের প্রতিষ্ঠা। 'তিরুবাদূর্ পুরাণম্' নামক এক খানি গ্রন্থে এই তর্ক যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

শৈব সাহিত্যের দ্বিতীয় ধারার প্রধান কবি 'ঞান-সম্বন্ধর্'। এই ধারায় ৬৩ জন ভক্তের উল্লেখ আছে। 'মাণিক্ক বাশগর্' সে ৬৩ জনের পরিগণিত নহেন। ঞান সম্বন্ধর্ প্রমুখ শৈবভক্তগণের ধর্ম্মের শত্রু জৈনগণ। ইঁহাদের তর্ক যুদ্ধের বিবরণ ও ভক্তগণের জীবনী 'তিরুত্তোণ্ডর্ পুরাণম্' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। চিদম্বরম্ অঞ্চলে শীগারী গ্রামে ঞান সম্বন্ধর্ জন্ম গ্রহণ করেন চিদম্বরমে একটী পবিত্র শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ইঁহার দুই শিষ্য ও কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম 'সুন্দরর্' ও 'অপ্পরর্'। ইঁহাদের কবিতাসমূহ সাধারণতঃ 'দেবারম্' (দেবাই) নামে পরিচিত (আর্য্যবর্ত্তে যেমন তুলসী, কবীর প্রভৃতি গুরুগণের 'দোহা')। সম্বন্ধর্ প্রণীত দোহা বা দেবারম্ সমূহের সংখ্যা ৩৮৪। সমগ্র গ্রন্থ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। সুন্দরর্ ও অপ্পরর্ প্রণীত দেবারম্ সমূহ এক এক খণ্ডেই সমাপ্ত হইয়াছে। তামিল শৈবগণের মধ্যে এই তিন জন কবি ও ধর্ম্মপ্রচারক এত সমাদৃত হইয়াছেন যে ইঁহাদের জীবনীর সহিত অসংখ্য অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। ইহারা ৬৩ জন ভক্তের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ; এবং অন্যান্য যাবতীয় ভক্তগণের সহিত ইহাদের জীবন কাহিনী লইয়া 'শেক্কিরার্' নামক কবি যে তিরুত্তোণ্ডর্ পুরাণম্, পেরিয় পুরাণম্ বা মহাপুরাণম্ নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন শৈব তামিলগণের মধ্যে তাহার অত্যন্ত সমাদর! এই প্রসঙ্গে একটী কিম্বদন্তী উল্লেখ্য যোগ্য। মদুরারাজ সুন্দর পাণ্ড্য জৈন ছিলেন। তাঁহার ৮০০০ সভাসদ্ সম্বন্ধরের নিকট তর্কে পরাজিত হওয়ায় তাহারা প্রত্যেকে রাজাদেশে মৃত্যু দণ্ড ভোগ করে ও জৈন রাজা সম্বন্ধর্ প্রচারিত শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। এই সুন্দর পাণ্ড্য খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে জীবিত ছিলেন।

তামিল বৈষ্ণব সাহিত্য শৈব তামিল সাহিত্যেরই সম সাময়িক ও কিঞ্চিৎ উত্তর কাল ব্যাপী। রামানুজের স্থিতি কাল দ্বাদশ শতক। তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যই প্রধানতঃ তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যের রচয়িতা। ইহারা তামিল ভাষায় 'আড়্বার্' বা বৈষ্ণব ভক্ত নামে পরিচিত। ইহারা সকলে যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের একত্র সমাবেশে 'নালায়ির প্প বন্ধম্' (—চারি সহস্র কবিতা] বা 'পোরম্ভ প্প বন্ধম' (—মহা গ্রন্থ) নামক বৈষ্ণব গ্রন্থ হইয়াছে।

শৈব সাহিত্য অপেক্ষা বৈষ্ণব সাহিত্য কাব্যের হিসাবে অপকৃষ্ট। তবে শৈব সাহিত্যে তিরুবাসগম্ ও দেবারম্ সমূহ যেমন শৈবদিগের 'বেদ' স্বরূপ, বৈষ্ণবদিগেরও সেইরূপ 'নালায়িরপ্ প্রবন্ধম্'। নালায়িরপ্ প্রবন্ধমের দুইটী খণ্ড 'পেরিয় তিরু মোড়ি' (শ্রীমহাবাক্য) ও 'তিরু বায়্-মোড়ি' (শ্রীমুখের বাণী) বৈষ্ণবগণের নিকট আমাদের গায়ত্রী-মন্ত্রের ন্যায় পবিত্র।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে তামিল সাহিত্যে কোনও উল্লেখযোগ্য সাহিত্য উদ্ভূত হয় নাই। এই কালের মধ্যে কোন বিখ্যাত সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় নাই। এই কালকে তামিল সাহিত্যের জড় যুগ বা নিষ্ক্রিয় যুগ বলা যায়। ইহার পরে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে তামিল ভাষায় পুনরায় সাহিত্য চর্চ্চা আরব্ধ হয়। এই যুগের বহু গ্রন্থই 'অতি-বীর-রাম-পাণ্ডিয়ন্' নামক একজন পাণ্ড্যদেশের রাজার নামে প্রচারিত। ইঁহার প্রকৃত নাম 'বল্লভ দেব' এবং ইনি খ্রীষ্টীয় ১৫৬৫ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইটী সাধারণতঃ তামিল সাহিত্যে অনুবাদের যুগ। 'নেইড়েদম্' (নৈষধম্) নামে ১১০০ শ্লোকে সমাপ্ত নলচরিত বিষয়ক একখানি মহাকাব্য 'অতি-বীর-রাম' রচিতবলিয়া পরিচিত। 'কাশী কাণ্ডম্' নামে স্কন্দ পুরাণের কাশীকাণ্ডের অনুবাদ, এবং লিঙ্গ ও কূর্ম পুরাণ অতিবীররামের নামে প্রচলিত। সম্ভবতঃ কোনওটাই তাঁহার রচিত নহে, তাঁহার আদেশে অনাথা তামিল পণ্ডিতগণের রচনা তাঁহার নামের সহিত গাঁথিয়া গিয়াছে। বল্লভদেব বা অতিবীর রাম পাণ্ডিয়ন্ যে আমাদের বল্লালসেন বা ভোজরাজ বা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! তাঁহারই যুগে অন্যান্য অনেক সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে; মহাভারতের অনুবাদ হইয়াছে; বেদান্ত দর্শন ও শৈবদর্শনের অনুবাদ হইয়াছে; এবং অনেক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের ও অনুবাদ হইয়াছে। আদিরসাত্মক খণ্ড কাব্যও অসংখ্য রচিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে শৈব ধর্ম্মের তান্ত্রিকতার পরিণামে বহু সিদ্ধ (তামিল 'শিত্তর্') তামিল দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই কালে আরব দেশ হইতে রসায়ণ ও ইন্দ্রজাল বিদ্যা তামিল দেশে আনীত ও আলোচিত হয়। ইহার পূর্ব্বে রসায়ণের আলোচনা হয় নাই। এই কালে সিদ্ধগণ 'ঋষি' নামে বিদিত হইতেন এবং হিন্দু ধর্ম্ম বিদ্বেষী মত প্রচার করিতেন। ইহাদের জাতি বিচার ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষেই এক কালে এই শৈব তান্ত্রিকতা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছিল, এই সিদ্ধগণের 'বুজ্ রুগি' অনেক প্রকার

ছিল। ইহারা আপনাদিগের অতি অদ্ভুত অদ্ভুত নাম রাখিতেন। কেহ 'অগস্ত্য,' কেহ 'কপিল' কেহ 'শঙ্করাচার্য্য,' কেহ 'গৌতম' কেহ 'তিরুবল্লুবর্' বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেন। কেহ কেহ আগস্ত্য শিষ্য, গৌতম শিষ্য বা কপিল শিষ্য সাজিতেন। এইরূপে নানা নামকরণের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া ইহারা হিন্দু ধর্ম্ম ধ্বংস করিবার উপদেশ দিতেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী তামিলগণের প্রসাদে খ্রীষ্ট ও ইঁহাদের নিকট সদ্‌গুরু বলিয়া সমাখ্যাত হইয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে আধুনিক তামিল সাহিত্যের কাল। বলা বাহুল্য ঊনবিংশ শতকের পূর্ব্বে গদ্য সাহিত্য ছিল না, এবং ইউরোপীয় প্রভাবেই (ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায়) এখানেও গদ্য সাহিত্য গঠিত হইয়াছে। আধুনিক সাহিত্যের প্রথম দিকে কয়েক খানি কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বীর শৈবদিগের অনুবাদ গ্রন্থ 'প্রভু লিঙ্গ লীলা' ও নীতি-বিষয়ক 'নীতি-নেরি-বিলক্কম্' (পট্টনত্তু পিল্লেই কৃত) প্রধান। অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইজন প্রধান কবি 'তায়ুমান বর' ও 'বেশ্‌চি'। তন্মধ্যে 'বেশ্‌চি' একজন ইটালী দেশীয় ইউরোপীয়। এদেশে থাকিয়া তিনি তামিল শিখিয়া কুড়ালের অনুরূপ উৎকৃষ্ট মহাকাব্য 'তেম্বাবনি' লিখিয়াছিন। ইনি যে প্রকার তামিল ভায়া ও ব্যাকরণ অলঙ্কারাদির জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা প্রশংসার্হ। ইনি গদ্য সাহিত্যও অনেক লিখিয়াছেন। নাটকাদি নানাবিধ সাহিত্য সৃষ্টি ঊনবিংশ শতাব্দীতে হইয়াছে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য সাহিত্যিক 'তাণ্ডব-রায়-মুদলিয়ার্'। পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ইনি গদ্য অনুবাদ করিয়াছেন। একালে অসংখ্য তামিল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে বটে, তবে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য কিছুই নাই। মুদ্রক (Mudroch) লিখিত তামিল মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা (১৮৬৫ পর্য্যন্ত) হইতে বঙ্গসাহিত্যের সহিত তুলনা মূলক মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা ফুটনোট প্রদত্ত হইল।*

---

*		Bengali	Tamil
1.	Protestant Books and Tracts	263	587
2.	Roman Catholic Publications	2	47
3.	Mahammadan Books	41	36
4.	Saiva Books	37	237
5.	Vaishnava Books	80	103
6.	Vedantic Books	40	101
7.	Br hma Samaj Books	51	3

বঁধু-মিলনে

[শ্রীভুজঙ্গধর রায়-চৌধুরী এম্ বিএল]

নব তপন মণি কিরণ নিকর মৃদু পরশে
সরসতর শোহন কর বিকশে সর-পদ্ম,
নবাঙ্কুরতি-চপলগতি তরল তনু সরসে
ঈষত ফুটি রয়েছে দুটি নয়ন লীলা-সদ্ম,
রস-যুবতী-কলহ-রতি-বিজয়-কেলি-হরষে
গরব ভরে বিরাজ করে মধুর মুখচন্দ,
মানস-লোভা সে মুখ-শোভা অমিয় ধারা বরষে,
তাহাতে ডুবি চিত্ত লুভী পিইবে মকরন্দ !

* * *

কমল-কর-দলেতে ধরি ললিততর বংশী
রচিবে বঁধু গলিতামৃতে স্বরের সরোবর,
বিকচরাগ-কমল-বনে পশিয়া মন-হংসী
লুকাবে কবে গভীর তার মরমে মনোহর !
সহজ রসে সতত ভরা হাসির ঘন বীথিতে
অধরমণি মাধুরীধারা ঢালিবে অবিরল,
সুধার সেই নিঝর জলে গাহন করি নিতি সে
কবে গো হিয়া দাহন-জ্বালা করিবে সুশীতল ?

* * *

করুণা বিতরণে কৃপণ হবে তুমি কেমনে ?
নিষ্ঠা করি যারা চরণে পড়ি রয়
দীক্ষা ধরিয়াছ দানিতে বরাভয়,
কে আছে তব সম বিঘ্ন-বিনাশন ভুবনে ?

8.	Jurisprudence	49	19
9.	Ethics	59	48
10.	Medicine	24	43
11.	Poetry & Drama	53	103
12.	Tales	53	42

এই যে পথে পথে তোমার পরিচয়
শ্যামল রূপরাশি তমালে পড়িরয়
তনুর সৌরভ হতেছে অনুভব প্রসূনে !
*   *   *
এই যে দাঁড়ায়ে সম্মুখে তুমি !
মাধুরীর স্রোতে মরমের ভূমি
উজ্বল পরিপূর্ণ !
দক্ষিণে বামে পশ্চাতে মম
যে দিকে তাকাই ওগো মনোরম !
উছলি পড়িছে ঝরিছে ঝরিছে রূপের কিরণ চূর্ণ !
তুমি যে এসেছ হে রস-পাথার !
এ ছুটি নয়ন সাক্ষী তাহার
সংশয় নাহি বিন্দু ।
বাহু পশারিয়া ধরিবারে যাই—
এ কি বিস্ময় ! নাই ! নাই ! নাই !
ভাগ্যে শুকাল সিন্ধু !
ও গো ! একি হল ! মজিল হৃদয় !
এই কাছে আসে ! ওই দূরে রয় !
নেহারি কেবল ত্রিভুবন ময়
কিশোর বদন ইন্দু !
*   *   *
কত দিনে আর এ কর আমার
স্নিগ্ধ নিবিড় চিকুরে তাহার
বাঁধিবে মোহন চূড়া !
অলি পাঁতি সম কুন্তল দল
চিকণিয়া দিবে ললাটে তরল
হরি-চন্দন-গুঁড়া ?
শুনিবে শ্রবণ মৃদুল বচন
নেত্র হেরিবে বিপুল নয়ন
মধুর অধর মধুর বদন
আনন দিবে মোর ?

বঁধুয়ার মম চরিত চপল
চিত্তে আমার হইবে অচল,
রূপেতে রহিব ভোর ?

*　　*　　*

এ জগত মাঝে আর্ত্ত জনার দয়াল বন্ধু তুমি
কেমনে ভুলিবে আর্ত্তের নাদ
দরশন দানে না পুরাবে সাধ
রহিলে চরণ চুমি ?
মধুর মধুর মুরলী তোমার
তুলে নিক্কন, তাহারি মাঝার
এমন আকুল ক্রন্দন ভার
পশিবে না কি গো শ্রবণে তোমার বিগলি চিত্ত-ভূমি !

*　　*　　*

হেন কি সুদিন হবে
বক্ষ আমার বিপুল বক্ষে
চক্ষু আমার কমল চক্ষে
ওষ্ঠ মধুর বিম্ব অধরে
শ্রবণ মোহন মুরলীস্বরে
পরাণ মৃদুল হাসির সরসে
মরম মধুর আলাপের রসে
চিত্ত আমার চুপে চুপে চুপে
বিলাস-সিন্ধু বঁধুয়ার রূপে
ছুলিবে মজিবে চুমিবে রসিবে
ভাসিবে ডুবিয়া রবে ?
কবে সে সুদিন হবে ?

———

নারীর ভাগ্য

[শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী]

পিতা তারাকান্ত বাবু পুত্র নিশিকান্তের পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আরত দেরী করা চলে না নিশি, তোমার মার প্যানপেনি দিন দিনই বাড়চে"—

নিশি "রোমান্‌ল" এক থানি টেবিলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসু ভাবে পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "কিসের দেরী বাবা!"

শীতকাল। তারাকান্ত বাবু গায়ের কাপড় থানা টানিয়া গায় দিয়া খাটের উপর বসিয়া বলিলেন, "আর কিসের দেরী বাবা! মাধুরী যে মস্ত বড় হ'য়ে পড়েছে দেখচো না! এই মাঘ মাসে ১৪ পূর্ণ হ'য়ে পনেরতে পড়বে। বিদেশে আছি তাই রক্ষে, নইলে যে বাড়ন্ত মেয়ে, দেশ হ'লে এদ্দিনে একঘরে করত। দাদা ত ফিরেও তাকান না।"

নিশি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "যতবড় ভাব্‌চেন বাবা, মাধু ততবড় হয়নি কিন্তু! ওটাতে আমাদের সংস্কারও আছে খানিকটা বার বছরে যদি বিয়ে না দেওয়া গেল, আমরা নিজেরাই মনে করি মেয়েটা যেন হাতী হ'য়ে উঠেছে, পাড়াপড়শী বল্‌বে তাতে আর কথা কি? বেশ পড়ছিল, ইস্কুলও ছাড়িয়ে দিলেন!"

অন্য সময় হইলে পিতা বর্ম্মা সিগার ধরাইয়া এই বিষয় লইয়াই মস্ততর্ক জুড়িয়া দিতেন, এবং যতক্ষণ সেই তর্কের আদিম বস্তু মাধুরী আসিয়া খুল্লতাতকে একরূপ টানিয়া অন্য বিষয়ে মনঃ সংযোগ না করাইত, ততক্ষণ তর্ক কিছুতেই থামিত না। কিন্তু আজ আর তিনি তর্কের দিকে না গিয়া বলিলেন, "না, ও বেশ হ'য়েছে! Fourth class এই ইস্কুল ছাড়ান উচিত ছিল। যাক্‌গে, যা হ'য়েছে বেশ হয়েছে। অগ্রাণের শেষেই এবার কন্‌কনে শীত পড়েছে। আমারও সর্দ্দি কাশিটা যাচ্ছে না। তানা হ'লে, বুঝতে পেরেছ নিশি, আমি নিজে গিয়ে সম্বন্ধটা ঠিক করে ফেল্‌তুম।" নিশি বলিল, "অকুলীন যে! জ্যেঠা-মহাশয়ের কি পছন্দ হবে?" তারাকান্ত বাবু শুইয়া সিগারেট টানিতেছিলেন। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "তাঁর কথা ছেড়ে দাও। গরজ ত তাঁর নয় গরজ আমাদের। আমি বলি একদিন পরে বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হবে। তুমি গিয়ে দেখে শুনে ঠিক করে এস। মাধুরীর সেদিনকার তোলা ফ'টো

নিয়ে চলে যাও।" নিশি সোৎসাহে বলিল, "বেশত, আমারও এই Occasionএ ঢাকা বেড়িয়ে আসা হবে। আচ্ছা আমি মার সঙ্গে পরামর্শ করে আসিগে।"

নিশিকান্ত বাড়ীর ভিতর গেল তাঁহার জননী ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া বধু সুমতির সাহায্য ভাঁড়ারের হাঁড়িকুড়িগুলি রৌদ্র হইতে ঘরে আনিয়া ঝাড়িয়া পুঁছিয়া রাখিতেছিলেন। উপরে বসিয়া মাধুরী তাহার পিতা তারাকান্ত বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অন্নদা বাবুকে "মেঘনাদ বধ" কাব্য পড়াইয়া শুনাইতেছিল। বালিকার কোমল কণ্ঠে উচ্চারিত "মধুসূদনের" মধুর কবিতাবলী নিশিকান্তের কাণে যেন মধু বর্ষণ করিতেছিল। নিশিকান্ত ভাঁড়ারে ঢুকিয়া বলিল, "মা জননী।" মাতা বলিলেন, "কেন বাবা, এখন খেতে দেব? আসন দেওতো বৌমা।"

সুমতি একটু ঘোমটা টানিয়া আসন পাতিয়া দিল। আসনে বসিয়া নিশি বলিল, "না মা জননী, এখন খেতে আসিনি। মাধুরীর বিয়ের পরামর্শ ক'ত্তে এসেছি। এমন মেয়ে জ্যেঠামহাশয় পাড়াগেয়ে দোজবরে দিতে চাচ্ছেন।" মা জননী একমুখ হাঁসিয়া কতগুলি বড়ি কৌটায় তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "এরচেয়ে ভাল কোথায় পাচ্ছ নিশি? কুলীনের ঘরের ভাল বরের যে বড্ড দাম। ২৫ বছরের ছেলে তার আর দোজবর কি?" নিশি বলিল, "ঢাকার ছেলেটি মন্দ কি?" মাতা বলিলেন, "মন্দ হবে কেন, সবই তো ভাল। কিন্তু তোমার জ্যেঠামশায়ের যে অকুলীনের বেজায় আপত্তি। শেষ সন্তান, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো আর বিয়ে দিতে পার্‌বে না। মিছি মিছি ঢাকায় গিয়ে কি হবে।" নিশি বলিল, "তাতে, ভাবিয়ে দিলে যে।"

২।

নিশি যখন দেড় বছরের শিশু তখন গর্ভধারিণীকে হারাইয়াছিল। দুই বছর বয়সে বিমাতা ওরফে মা জননীকে পাইয়া মায়ের অভাব একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। বিমাতা বলিয়াই হয়ত নিশিকে চিরদিন পুত্রবৎস্নেহ করিতেন। মাতাপুত্রে সংসারের পরামর্শ হইতে College এর strike পর্য্যন্ত সমস্ত কাজের ও অকাজের কথাবার্ত্তা হইত। নিশিকান্তের জ্যেঠাই মা যখন বহু সন্তানের মধ্যে মাধুরীকে তিন মাসের শিশু রাখিয়া ইহ লোক হইতে বিদায় নিয়াছিলেন, তখন নিশির মা জননী তাহাকে বুকে তুলিয়া নিয়া তাঁহার যে সন্তান হয় নাই সে জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

হায় রে, যে বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিতে হয়, তাঁ'র ত তাই নাই তবু মাধুরীকে নানা কৃত্রিম উপায়ে বুকের দুধের অভাব বুঝিতে দেন নাই। অনেক বড় হইয়া মাধুরী বুঝিয়াছে, যে সে কেন "মা"কে বলে "মা" আর "বাবা"কে বলে "কাকা"!

অন্নদা বাবুকে লোকে বলিত, একটু বাতিকের ছিট আছে। বস্তুতঃ সেটা অনেকটা সত্য, তাঁহার উপার্জ্জন যে কত ছিল, তাহা কেহই জানিত না জীবন ভোর পোষ্টাফিসে চাকুরী করিয়া তিনি নিজের ব্যতীত পরিবারের অন্ন সংস্থান করিতে পারেন নাই অথচ কোন বদ খেয়ালও ছিল না। পরিবার পালন করা কাজটা ছিল ছোট ভাইটার। এই পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব পরিণতবয়স্ক ভ্রাতৃ-যুগলের মধ্যে মনের অথবা মতের কোনই ঐক্য ছিল না। দুইটা মেঘের ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাত সচরাচর নাও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের দুজনের দেখা হইলেই বাক্যালাপ ব্যাপারটা কলহে পর্য্যবসিত না হইয়া যাইতই না। ইদানীং অন্নদা-বাবু ভ্রাতার উপর রাগ করিয়া বারাসত গিয়াছিলেন। দুষ্ট লোকে বলিত সেটা তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, কেন না নিকটে থাকিলেই মাধুর বিয়ের পণের টাকা ভাইটা তাঁহার কাছ থেকে আদায় করিতে কতক্ষণ!

নিশিকান্ত মেদিনীপুরে গিয়া জ্যেঠামহাশয়ের পছন্দসই সেই কুলীন পুত্র সুখময় রায়কে দেখিয়া আসিয়া পিতাকে বলিল, "এটা ত একরকম ঠিক করে এসেছি, ছেলেটা "সেটেলমেণ্ট" এ ঢুকেছে শীগগিরই "কানুন গো" হবার আশা আছে। কিন্তু দেশে সেই মোটা ভাত কাপড়। ঢাকার ছেলেটা ও শুনলুম অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে কিন্তু জ্যেঠামশায়—"

কথা শেষ হইতে না হইতে জ্যেঠামহাশয় মাধুরীকে দেখিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঢাকার ছেলেটার কথা শুনিয়া তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। "তোকে পই পই করে বারণ কর্‌চি তারা, তুই মাধুর বিয়েতে সর্দ্দারি কর্‌তে আসিস্ না।"

"কে তবে কর্‌বে দাদা, তুমি ত ফিরেও চাওনা মেয়েত এখনঃ ছোট নয়, সর্দ্দারি কাজেই যে কর্‌তে হয়।"

"আহা হা, "মার পোড়ে না পোড়ে মাসী, ঝালখেয়ে মরে পাড়াপড়শী," এও হ'য়েছে তাই। বড় মেয়েটাকে অকুলীনে বিয়ে :দিয়েছিলি, বেশ হ'য়েছে মেয়ে মরে আমার লজ্জা ঘুচিয়েছে।"

তারাকান্ত বাবু শান্তস্বরে বলিলেন, "তাইত দাদা, :রাজার ঘরে তাকে

দিয়েছিলেম, ভাগ্যে সইল না! মাধুকে কুলীনে, হাভাত ঘরে দেবে এই তোমার মত? মেয়েটা না খেয়ে মরুক্!"

"না খেয়ে মর্‌বে কেন, যত অলক্ষুণে কথা।"

"না খেয়ে মরবে না ত কি! কুলধুয়ে জল খাবে! এত পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছি, এখন বেনাবনে এই মুক্তো ছড়াই, যেমন মেয়ের ভাগ্যি তেমনি ত বাপের মতি হ'বে।"

"তুই চুপকর্ হাঘাগ, হতভাগা, আমার মেয়ে, আমি যা খুসী করব। আমার সঙ্গে কেউ লাগতে এস না।"

উত্যক্ত হইয়া তারাকান্ত বাবু রুক্ষস্বরেই বলিলেন, "বটে, তা বেশ, আমার বাসায় বসে নয়, বারাসতে গিয়ে যা খুসী করগে, নয়ত দেশের বাড়ী পড়ে আছে।"

অন্নদা বাবু লাফাইয়া উঠিলেন, "এখনি চল্লুম, দে, আমার মেয়ে দে—"

"মেয়ে যায়ত এখুনি নিয়ে যাও না—"

"মাধু ও মাধু—"

নিশিকান্ত ঠোঁটের হাসি ঠোঁটে চাপিয়া কষ্টে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের অভিমুখে চলিল "মাধু খেতে বসেছে জ্যেঠামশাই! আপনিও খপ্ করে 'চান্' করে নিন্ তারপরে সম্বন্ধের কথা বল্‌ব সব।"

"না এখুনি যাব, তোর বাবা আমাকে গরীব বলেইত অপমান ক'রেছে। বউমাকে বল্‌গে আমি মাধুকে নিয়ে যাব। তোদের বাড়ীর দাসীবৃত্তি করতে আর এখেনে রেখে যাব না।"

বলিতে বলিতে, জুতা জামা পরিতে পরিতে ভিতরে দিয়া দেখিলেন, মেয়ে সত্যসত্যই খাইতেছে। নিশির মাতা তা'র পাতে "চিতলের কোল" ভাজা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন; "আস্তে আস্তে খাস্‌রে মাধু, কোর্‌মা নাব্‌ল ব'লে।"

রবিবার; একটু "ভালমন্দ" আহারের ব্যবস্থা হইত। ক্রুদ্ধ জ্যেঠামশায়ের সাড়া পাইয়া বধূ সুমতি তৈল গামছা হাতে লইয়া সম্মুখে আসিল। জুতাজামা একপ্রকার জোর করিয়াই কাড়িয়া লইল, তিনি একবার মুখে বলিলেন, "না মা না, আমি মাধুকে নিয়ে এখনি চলে যাব"

সুমতি তৈল মাখাইয়া দিতে দিতে স্নিগ্ধস্বরে বলিল,"তা বই কি,যাবেন বই কি, মা বল্লেন, আপনি এলেন বলে তিনি নিজে কোর্‌মা আর গল্‌দাচিংড়ি দিয়ে কফি দিয়ে রাঁধ্‌লেন তাড়াতাড়ি 'চান্' করে নিন্, ভাতকটা জুড়িয়ে যাবে নইলে।"

বলা বাহুল্য বৃদ্ধ নির্ব্বিকার ভাবে স্নান আহার শেষ করিয়া উপরের ঘরে

বিশ্রাম করিতে গেলেন। তথন ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে বুঝাইল "কুলীনের ঘরেই বিয়ে হবে, আপনি মাত্র ১৫০০৲ টাকা পণের দরুণ যোগাড় করুন, আর সব আমরা চালাব।"

দুইটী বৃদ্ধ যে কলহটাকে বর্ষার মেঘের মত নিবিড় করিয়া তুলিাছিলেন, ভ্রাতৃবধূ তাঁহার পাক পাত্রের মায়ামন্ত্রের প্রভাবে তাহাকে শারদাকাশের সুশুভ্র অভ্র খণ্ডের মতই লঘু করিয়া গগনপ্রান্তে ভাসাইয়া দিলেন। অন্নদা বাবু বলিয়া গেলেন, "আমি ২।১ দিনের মধ্যেই টাকাটা নিয়ে আসব। ১৪ই মাঘ ত দিন? ঢের দেরী আছে।"

(৩)

অন্নদা বাবু সেইযে পলাইলেন, আর ১৪ই মাঘ বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অপেক্ষায় কোন কাজই বাকি ছিল না, কাজেই তিনি সোর গোল করিয়া এঘর ওঘর করিয়া নিমন্ত্রিত নিমন্ত্রিতাদের জানাইতে লাগিলেন, "মাধুর বিয়ের পণের টাকা আমি এনেছি।" কিন্তু নির্জ্জনে ভ্রাতার হাতে ৮০৲ টী টাকা দিয়া বলিলেন, "এর বেশী ধার পেলুম না।"

তারাকান্ত বাবু যদিও এই আত্মসর্ব্বস্ব ভ্রাতাটীকে ভাল করিয়াই চিনিতেন, তথাপি আশা করিয়াছিলেন, এই শেষ সন্তান ও একমাত্র বাৎসল্যের আধার ইহার বিবাহে অন্ততঃ ৩০০৲ টাকা দিবেনই। এথন ৮০৲ টী টাকা গুণিয়া দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া উঠিল, একবার মনে হইল, টাকাটা দাদার গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলেন, "বেরোও আমার বাড়ীথেকে, আমি একাই মাধুর বিয়ে দেব।" কিন্তু আত্মীয় স্বজনে বাড়ী ভরা, বিশেষ এথনও বিবাহ হয় নাই। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া টাকা কয়টী পুত্রের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নাও নিশি তোমার জ্যেঠামশাই মাধুর বিয়েতে ভিক্ষে দিয়েছেন, আজ রাখ, কাল ফিরিয়ে দেব।"

অন্নদা বাবু টাকা ভিন্ন আর একটি উপকার ভ্রাতার করিয়াছেন। তাঁহাদের দেশ হইতে দুইটী বিধবা, জাতি সম্পর্কে খুল্লতাতপত্নীকে মেয়ের বিবাহ দেখাইতে অনেক মাথার দিব্য দিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা আসিয়াই তারাকান্ত বাবুর প্রদত্ত দানসামগ্রী ও কন্যার অলঙ্কার দেখিয়া নাকসিঁটকাইতে লাগিলেন। "পাগল হউক যাহাই হউক এতগুলো টাকা অন্নদা তারার হাতে দিয়েছে। তারা ত কই দানসামগ্রী তেমনে দয়নি। ৮০০৲ টাকার গয়না দিলেও ত কেমন হ'ত। আহা, মেয়েটার মা নেই, কে কি করে গা? ছোট বউত ছেলে মানুষ, কি মানুষই ছিল বড় বউ!"

বিবাহের গোলে বিশেষ এই আচার নিষ্ঠাপরায়ণা নবাগতাদের আহারের আয়োজনে সুমতি ও গৃহিণী নিতান্তই ব্যস্ত ছিলেন। তাই ইত্যাকার টীকা টিপ্পনি শ্রবণ করিয়া তাঁদের কর্ণকুহর তৃপ্ত হইতে পারিল না। কিন্তু তারাকান্ত বাবু আভ্যুদয়িক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও হিতৈষিণীগণের সুধামাখা বাক্য শুনিতে লাগিলেন। শুনিয়া একবার সমীপবর্ত্তী ভ্রাতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন মাত্র

তারাকান্ত বাবু বি, এ, পাশ করিয়া কলিকাতায় একটি স্কুলে মাষ্টারি করিতেন। তাহাতে মাহিয়ানা ১০০৲ টাকা আর টিউসনি করিয়া ২৫৲ টাকা পাইতেন। ছেলে পড়াইয়া নিজের সংসার চালাইয়া হাতে বড় বেশী কিছু থাকিত না। নিজের মেয়ে নাই তথাপি ভ্রাতুষ্পুত্রীরদিকে চাহিয়া তিনি প্রতি মাসের প্রথমেই ১০৲ টাকা Post officeএ রাখিয়া আসিতেন। মাধুরী-কেও তিনি Bethune schoolএর 2nd class পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। এখন সেই ৫০০৲ টাকা উঠাইয়া এবং কিছু ধার করিয়া মাধুরীর বিবাহের ত্রুটি হইতে দিলেন না। যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে মাধুরীর বিবাহ হইয়া গেল।

(৪)

বাসি বিবাহের দিন রাত্রে মাধুরী শ্বশুরবাড়ী হরিপুরে আসিয়াছিল। বধূ দেখিয়া শাশুরী ও কুটুম্ব কুটুম্বিনীগণ যত তুষ্ট হইয়াছিলেন, শ্বশুরালয় দেখিয়া বেথুন স্কুলের পুরস্কারপ্রাপ্তা ছাত্রী মাধুরীলতা তত সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ঘোমটার ভিতরে মনে মনে ভাবিতেছিল, "মাগো মা, কাকামণি যেন আমায় বনবাস দিয়ে'ছে। বইতে পড়্‌তেম, "পাখী ডাকা, ছায়ায় ঢাকা" রবি বাবুর পল্লীবাটটী ভাল লাগে। চোখে দেখে, বিশেষ বড় হয়ে থেকে কি ওসব ভাল লাগ্‌তে পারে? বিকেল বেলা বেড়াতে বেরুলে, বাঁশ বাব্‌লা খেজুর গাছের পাতের আড়ালে অস্তগামী সূর্য্যের রক্ত আভা দেখতে মন্দ নাও হতে পারে, কিন্তু সন্ধ্যে হতে নাহতে' ওরে বাস্‌রে' কি ভীষণ ঝিঁঝিঁর ডাক। ছুত্তোর কবির ঝিল্লিমুখরিত সন্ধ্যা এরচেয়ে কলিকাতার মটরের প্যাঁ পোঁ ট্রামের ঘড়্‌ ঘড়্‌ অনেক ভাল।" সে যাত্রায় অল্প কয়েক দিন থাকিয়া বেচারার ফাঁড়া কাটিয়া গেল। নিশি আসিয়া জামাই সুখময় ও মাধুরীকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সুখময় সেখান হইতে কার্য্যস্থানে চলিয়াগেলেন। কিন্তু মাস দেড়েক পরেই মাধুর শ্বশুরের অসুখের সংবাদ পাইয়া নিশিকান্ত আবার সাশ্রুনয়না মাধুরীকে মায়ের স্নেহের কোল হইতে নিয়া শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া আসিল। আসিবার সময় সুখময়ের মাকে বলিল, "আপনি এখন মাধুর মা।" অল্প

বয়সে মা মরে যাওয়াতে আমরা ওকে ঘরের কাজকর্ম্ম কিছুই শেখাইনি। আপনি ওকে শিখিয়ে নিবেন। এতদিন লেখাপড়া নিয়ে ছিল কিনা, তাই আমরা, বুঝ্‌তে পেরেছেন।" ইত্যাদি।

তিনিও "তা হ'ক শিখিয়ে নেব বইকি বাবা" ইত্যাদি বলিয়া নিশিকে বিদায় দিলেন।

নিশির কথাটি যে শুদ্ধ বিনয় উক্তিনয়, তাহা তিনি দুএক দিনের মধ্যেই বুঝিয়া লইলেন। সংসারের দুএকটি কাজ ধীরে ধীরে নববধূর হাতে দিতে লাগিলেন। ঘরে ঝিচাকর ছিল না, তাহার মধ্যমবধূ স্বরমা সংসারের সমস্ত কাজই করিত। তাহার কার্য্যনিপুণতা দেখিয়া মাধুরী মনে মনে অবাক হইয়া যাইত। সে দিন সকালবেলা মাধুরীর কনিষ্ঠ দেবর জ্যোতির্ম্ময় মাছের চুবড়িটি মাটিতে রাখিয়া হাঁক ছাড়িল, "মেঝবৌদি, জল্‌দি কর বড্ড খিদে পেয়েছে। দেরী হলে আজ আর ভাত খাব না। স্বরমা রাঁদিতেছিল। সে মাধুরিকে বলিল, "ছোড়্‌দি ভাই, তারাতাড়ি আমাকে দুটো মাছ কুটে দাও না, নইলে ছোট টাকুরপো এসে আজ হাঁড়িকুড়ি চুরমার করবে।" মাধুরী সে কথা অবিশ্বাস করিল না। সে দেখিতেছিল, দুরন্তপনায় তাহার ননদ দেবরের জুরি মেলা ভার। সে তাড়াতাড়ি মাছ ও বঁটি নিয়া মাছ কুটিতে বসিল। কিন্তু দশ মিনিট ধরিয়া চিন্তা করিয়াও জীবন্ত কইমৎস্য ছেদনের প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারিল না। অবশেষে বঁটীর উপর বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ওদিকে ১০ বছরের বয়সেই "ডাকাত" আখ্যাধারী জ্যোতির্ম্ময় ওরফে "জ্যোতি," ছোট বোন ননীকে লইয়া স্নানের ঘাটের পথে যাইতে যাইতে আর একবার পাকের তাড়া দিতে আসিয়া "নতুনবৌদির" ভাব খানা দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল। এক মিনিটেই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, "ও মেজবৌদি, মজা দেখবে এস, এসনা এদিকে! নুতনবৌদি মাছ কাট্‌তে জানে না! লজ্জায় বসে কাঁদচে, হ'য়েছে মশাই হ'য়েছে, এতো আর class promotion নয়, যে রাত্তির জেগে পড়া মুখস্ত করলেই হ'ল! এতে বিদ্যে লাগে! সত্যি বৌদি, তোমার মহাকালী পাঠশালায় পড়াতে পারেনি। সেখানে নাকি রান্না বান্নাও শেখায়।"

মাধুরী লজ্জায় ঘৃণায় যেন মরিয়াগেল, ছোটমার উপরে যত রাগ হইতে লাগিল। কেন তা'কে আদর করিয়া ঘরের কাজ কর্ম্ম শেখায় নাই।

এমন করিয়া দিনের পর দিন খোঁচা খাইয়া মিষ্ট অনুযোগ শুনিয়া মাধুরী

একে একে সকল কাজই শিখিয়া লইল। দরিদ্র গৃহস্থের গৃহস্থালীতে সারা দিনই কাজ, সন্ধ্যার পর আহারান্তে অবসর। সেই সন্ধ্যাটি তাহার কাছে আগে যতই বিভীষিকাময় ছিল এখন অনেক সরস হইয়াছে, কেন না এই "উল্টো রাজার" দেশে সন্ধ্যাবেলায় ডাক আসে। দাদা, বৌদি, ছোটমা, কাকামণি, প্রায় প্রতিদিনই তাহার কাছে পত্র লিখিয়া থাকেন। দিনের কর্ম্মশ্রান্ত দেহমন সন্ধ্যাবেলার সেই অমৃত প্রলেপে যেন জুড়াইয়া দিত। কিন্তু সম্পর্কে ছোট অথচ পূর্ব্বে বিবাহিতা এই 'জা' টির সহিত মাধুরী ভাল করিয়া মিশিতে পারিল না। দেবর সুধাময় পত্নীর কাছে প্রতিদিনই প্রায় সুদীর্ঘ পত্র লিখিত। সে কলিকাতায় থাকিয়া B. A classএ পড়িতেছিল। কিন্তু মাধুরীর কাছে সুখময় পত্রলেখা আবশ্যক বিবেচনা করিত না। একদিন সুরমা ৫।৬ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্র পাইয়া রান্নাঘরে বসিয়া পড়িতেছিল, মাধুরী মৃদুহাসিয়া ক্ষুদ্র পরিহাস করিয়া বলিল "বাপরে, ছোরদি, চিঠিত নয় এটাযে প্রবন্ধ।"

সুরমা অর্থপূর্ণ বক্রহাসি হাসিয়া বলিল, "হু, প্রবন্ধই বটে। তুমি তার কি বুঝবে ভাই।"

মাধুরীর বুকের ভিতরটা যেন ছাঁত করিয়া উঠিল! বুঝিবেনা! মাধুরী বুঝিবে না! কেন, সেওত মূর্খ নয়।

সুরমা যেন তাহার গূঢ় অভিমানের ভাবটি বুঝিতে পারিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "লেখাপড়া জানলে কি হয় দিদি, সোয়ামীর সোহাগ পেতে বরাত চাই। নইলে রূপওত আছে, বিদ্যেও ত শুনি সরস্বতী, তবু বট্‌ঠাকুরের মনে ধরেনি কেন!"

তদবধি, মাধুরী নিজেকে জোর করিয়া সুরমার নির্জ্জনসহবাস হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিত। অবসরের সময় বরং দেবর ননদের লেখাপড়ার সাহায্যে যাইত, ঠাট্টা শুনিত ঠাট্টা করিত তবু স্বামী সোহাগিনীর সমালোচনার মধ্যে যাইতে চাহিত না। শাশুড়ী যে যখন তখন পাড়া পড়শীর কাছে বড়বধূর "বিদ্যের ব্যাখ্যা" করিতেন, শ্বশুর ও যে বড় বউমার সেবার পক্ষপাতী হইয়া ছিলেন:সেটা পল্লীদুহিতা অশিক্ষিতা সুরমার বড় হিংসার কারণ হইয়াছিল।

(৫)

জৈষ্ঠ মাসে আমকাঁঠালের তত্ত্ব লইয়া অন্নদা বাবু মেয়েকে নিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সুখময়ের আসার কথা ছিল বলিয়া বৃদ্ধ রসিক বাবু বৈবাহিককে একাই ফিরাইয়া দিলেন। অন্নদা বাবু একে রসিক বাবুর বাড়ীতে মেয়েকে দিনরাত কাজ

করিতে দেখিয়া চটিয়াছিলেন, তার পরে মেয়ে না পাইয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ফিরিয়া গেলেন। সুখময় ছুটিপাইল না, সুধাময় ভ্রাতাকে দেখিয়া বাড়ীতে আসিল।

মাধুরী তাহাদের প্রেমের অভিব্যক্তি দেখিয়া মাঝে মাঝে বুঝিত, তাহার জীবনে আর সব পাইয়াছে, কিন্তু যে জিনিসটী যে পরশ কাঠিটী পাইলে জীবনের সকল অভাব পুর্ণ হয়, সব লোহা সোণা হইয়া যায়, সে তাই পায় নাই, তাই সব পাইয়াও সে বঞ্চিতা, সে দুঃখিনী।

দুপুরে সুধাময় শুইয়া "ভূদেবগ্রন্থাবলী"'র পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে ঘুমাইবার চেষ্টায় ছিল। সুরমা ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর মুখে দুইটী পান গুঁজিয়া দিয়া পাখা হাতে লইয়া বিছানায় বসিল। "ওঃ! তুমিও ওই ঘোড়ার ডিম পড়চ না আছে গল্প, না আছে কিছু!"

সুধাময় হাসিয়া বলিল, "তুমিও মানে কি! আর কেউ পড়ে নাকি? "পড়ে না আবার? আমাদের মাষ্টারনি পড়েন যে; তাঁরইত বই!" "মাষ্টারনি কি রকম?"

"হাঃ হাঃ, তাও জাননা, এদ্দিন এসেছ! ছোটদি দুপুরে ঠাকুরপো আর ননীকে পড়ায় কি না, তাই তারা ওকে মাষ্টার বলে।"

"তা তুমি একটু লেখা পড়া শিখলেই পার সুরমা,"

"আমার বয়ে গেছে ছোটদির কাছে শিখতে"

"ছি সুরমা, তুমি জাননা, উনি ভাল লেখাপড়া শিখেচেন! তুমি বোধ হয় ওঁর সঙ্গে ভাল করে মিশে কথা কও না, তাই বৌদি যেন সর্ব্বদা একটু বিষণ্ণ"।

"না গো না, বটঠাকুর মোটেই চিঠি পত্তর লেখেননি কি না, ওত বিদুষী বিদ্যেভুষিতে, অথচ ৫।৬ পৃষ্ঠা চিঠি আসে মুরুখ্যু আমার কাছে, মানিনীর মানে ঘা লেগেছে বোধ হয়।"

"তা হ'বে, লেখাপড়া শিখেচেন একটু Sentimental হতে পারেন। আচ্ছা বৌদি তোমার কাছে সে কথা নিয়া দুঃখ্যু করেছেন নাকি।"

সুরমা এবার রাগিল, "খালি 'বৌদি' আর 'বৌদি' অত পছন্দ হ'য়েছিল ত নিজে বিয়ে করলেই হ'ত!"

সুধাময় হাসিয়া বলিল, "তুমি ত আর মরনি, বৌমরলযে দাদার, আর বিয়ে করব আমি! একা রামে রক্ষা নেই, আবার বিয়ে! তবেই হয়েছে! কিন্তু সুরমা, মেয়েরা বড্ড হিংসুক! কোথায় দাদা ও বেচারার খোঁজ খবর নেননা বলে দুঃখ করবে, না আমি দুটো জিজ্ঞাসা করতে মুখখানা হেসেলের

হাড়ির মত কালো আর ভারি করলে! লেখাপড়া না শেখার অশেষ দোষ।”
এবার সুরমা রাগ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল, সুধাময় হাসি মুখে তাস খেলিতে বাহির হইল! কিন্তু তাহার মনে ভ্রাতার ব্যবহারে একটা সন্দেহ জন্মিতেছিল। কয়েকদিন পরে সুধাময় পিতাকে বলিল, “বাবা, দাদার একা একা বড় কষ্ট হয় দেখে এসেছি নিজে রেঁধে খান, আমি বলি বৌদিদি ননীকে নিয়ে সেখানে গিয়ে থাকুন। রসিক বাবু নিতান্তই ভাল মানুষ, তিনি বলিলেন, “তা বটেইত, কষ্ট হচ্ছে বই কি, তা' এক কাজ কর সুধা, তুমি বৌমাকে বাপের বাড়ী রেখে এস, দেব বলেছি ভদ্রলোককে কিনা! মাসখানেক পরে ননীকে নিয়ে সুখের কাছে ওদের রেখে এস!” মাতাও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া রাজি হইলেন। আহা বাছা আমার একা থাকে! কি খায় না খায় কে জানে!” হায়রে মায়ের প্রাণ।

মাধুরী শুনিল তাহাকে মেদিনীপুরে যাইতে হইবে! শুনিয়া যেন অভিমানিনীর সমস্ত দেহ মন বাঁকাইয়া বিদ্রোহী হইয়া বসিল, ছি! ছি! ছি! তিনিত ডাকেন নাই। হয়ত তাহাকে তাঁহার মনেই ধ'রে নাই, তাই অমন নির্ব্বিকার উদাসীন ভাব! তবু সে যাচিয়া তাঁহার কাছে যাইবে?

সুরমা মুখের হাসিতে মনের হিংসার বিষ লুকাইয়া বলিল, “লোকে বলে মেঘ না চাইতেই জল, ছোড়দির হ'য়েছে তাই! যাই বল ভাই, ডবোল প্রমোশন পেয়েছ!”

মাধুরী কলিকাতায় গেল। ৫ মাস পরে যেন বন্দী আলোকের মুখ দেখিল! কাকা বলিলেন, “রোগা হ'য়ে গিয়েছ মাধু!” মাধু বলিল, “না কাকা, রোগা হইনি, মনটাই বড় কেমন করত। তারাবাবু হাসিয়া বলিলেন “দু বছর পরে আমার এই মা'টীর মত হ'বে মা, বুড়ো বাপ নিতে এলে আসতে চাইবে না।” মাধু সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, “কথ্খনো না, বৌদিদিটা খাঁটি পাথর! মায়া মমতা নেই! ও শুধু তোমাকে আর ছোট মাকেই ভাল বাসে।” পরস্পর বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া মা ও কাকা দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন।”

ইতিমধ্যে অন্নদাবাবুর রঙ্গস্থলে প্রবেশ! ভ্রাতৃবধু ভিতরে পলাইলেন। তিনি মাধুকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—“মাধু এলি? বেশ! তোর কাকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে! এর চেয়ে হাত পা বেধে জলে ফেলে দিলেই হ'তো!”

তারাকান্তবাবু অবাক হইয়া চাহিলেন—“কি রকম দাদা!” আরও গরম

হইয়া দাদা বলিলেন, "রকম আবার কি! জ্ঞাতি শত্তুর! এমন ঘরে বিয়ে দিয়েছিস্ যে একবেলা ভাত জোটে ত একবেলা উপোস!"

এবার তারাকান্ত বাবুর ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটিল। বা◌ংকের মত চেচাইয়া উঠিলেন, 'চুপকর, কুটুমের ছেলে বাইরে বসে আছে, ওঁর জ্বালায় লোক লৌকিকতাও যাবে দেখচি!"

-'ওঃ! ভারিত পাড়া গেঁয়ে কুটুম, তার আর লোক আবার লৌকিকতা! কালাছেলের নাম পদ্মলোচন!"

"বৌমা, ভদ্রলোক যতক্ষণ এখানে আছেন, দাদাকে রান্নাঘরে পিঠে পায়েয়েসের তদন্তে রাখগেত!"

সুধাময় বারান্দায় দাঁড়াইয়া মাথা আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে দুই ভ্রাতার বাক্যালাপ শুনিতেছিল। সহসা একটু হাসিয়া, একটু কাশিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "তালুই মশায়, আমরা পাঁড়াগেঁয়ে অসভ্য বটে, কিন্তু অতিথির অসম্মান করিনা।"

তারাকান্তবাবু ব্যাকুলভাবে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "তুমি চা খাবে ওঘরে চল বাবা, ওর কথা শুনো না।"

স্থিরভাবে স্নিগ্ধস্বরে সুধাময় কহিল, "আমাকে মাপ করবেন, একটু সবুর করুন, একটা কথা বলে যা'ব, তালুই মশায় আপনি দাদার কাছে যে পত্র লিখেছিলেন, তা আমি দেখেছি, ছেলের শ্বশুর দূর হোক্ মেয়ের শ্বশুর অমন চিঠি লিখলে আমরা তাকে 'ছি' 'ছি' বল্‌তুম। তা পাড়াগাঁয়েও এখন এই সব দেখে লোকে শিখবে। ছোট তালুই মশাই একবার পত্র খানা দেখুন তার পর ছিঁড়ে ফেলি। ওকি বৌদি হা করে শুন্‌চ কি? তুমি ওঘরে যাও।" ঘরের কোণে বজ্রাহতের মত স্তব্ধভাবে মাধুরী বসিয়াছিল, দেবরের কথা শুনিতেছিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া কপাটের আড়ালে গেল।

তারাকান্ত বাবু পত্র পড়িলেন পত্রখানি এইরূপ—

কল্যাণবরেষু।

এবার তোমাদেরদেশে মাধুরীকে আমি আনিতে গিয়াছিলাম। তাহার প্রতি তোমার পিতামাতা যেরূপ ইতরজনোচিত ব্যবহার করিতেছেন, তাহা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি। যতদিন তুমি পরিবার পালন না করিতে পার, আমি কলিকাতায় মাধুকে রাখিতে স্বীকৃত আছি। যখন সুবিধা হয়, তাহাকে তোমার

কাছে নিয়া রাখিও। আমার শিক্ষিতা মেয়ের অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই হইয়াছে এখন তোমাকে অনুরোধ যত শীঘ্র পার, তাহাকে তোমার কাছে নিও।"

তারাকান্ত বাবু বলিলেন, "উনি ত পাগল, কিন্তু তুমি তাত জান্‌তে না! এ চিঠি বেয়াইকে দেখিয়েছ কি বাবা।"

"না তালুই মশায়, কেউ দেখেনি।"

"বাবা, তুমি আমার মাথা রেখেচ কি আর বলব আমি, তুমি আজই মাধুকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

"না, না, আপনি চা খাবেন চলুন। ১মাস পরে আমি বাবার কথামত ওঁকে মেদিনীপুরে নিয়ে যাব। আপনি অত ব্যস্ত হ'বেন না, দিন্, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলি।"

(৬)

১টা মাস যেন মাধুরীর কাছে ১দিনের মত কাটিয়া গেল অবশেষে মেদিনীপুর যাইবার দিন আসিল। সুধাময় আবার এই ফাঁকে বাড়ীতে গিয়া দুই দিন থাকিয়া ননীবালাকে লইয়া আসিলেন। মাধুরী মাকে প্রণাম করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে কাকার হাত ধরিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল। গাড়ী ষ্টেশনে চলিল। তারাকান্ত বাবু মাধুকে বলিতে লাগিলেন, "মা, তুমি বড় হ'য়েছ, তোমাকে বুঝান্ কষ্ট হ'বেনা একটা কথা সব সময়ে তুমি মনে রেখ, ওই যে কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলে লিখে গেছেন "পতিকুলে তব দাস্যমপি শ্রেয়ম্," মেয়ে মানুষের পক্ষে অমন কথা আর নেই মা! নিজের ঘরকন্না কর্‌তে কি অপমান আছে! লেখাপড়া শিখেচ, শুধু টেবিলে বসে শেলি বায়রণ মুখস্থ কর্‌তে নয়, সংসার যাত্রা ভালকরে চালাতে, আদর্শ স্ত্রী হ'তে, আদর্শ মা হ'তে! সরস্বতীকে প্রণাম কর্‌তে হ'লেই যে রান্নাবান্না ছেড়েছুড়ে দিতে হ'বে, তারত মানে নেই! আর তোমরা অন্নপূর্ণার জাত, তোমরা যদি পদ্মহস্তের পরমান্নের থালা ছুঁড়ে ফেলে, দিনরাত বীণাপাণির বীণা বাজাও, লোকের কাণ জুড়োবে বটে, কিন্তু পেট ভরবে না যে মা! সবই চাই, ভরা পেটে সব ভাল লাগে। তোমরা ঠিক না হ'লে আমরা যে মা মিথ্যে!"

* * *

রাত্রি ১ টার সময় সুধাময় ঘোড়ার গাড়ী করিয়া সুখময়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনো সুখময় নাকি বাড়ী ফেরেন নাই। একদণ্ডে

সুধাময়ের কাছে যেন সমস্ত তিক্ত হইয়া গেল। চাকরটাকে কাঁচাঘুম ভাঙ্গাইয়া ডাকিয়া তুলিল, "হতভাগা বেটা, বাবু তোকে বলে নি যে আমরা আসব?"

সে হাঁউমাউ করিয়া বলিল, "হাঁ বলেছে বটেত, বাবু ত রোজ দুপুর রাতে এসেন আমি কি কর্‌ব।"

সুধাময় তাহাকে ধমক দিয়া তাহার সাহায্যে দাদার ঘরের তালা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল। ঘরের মধ্যে এক কোণে একটা হারমোনিয়ম্, এক পাশে আলনায় কতকগুলি কোচান কাপড় ও জামা ঝুলিতেছে, তিন চার জোড়া ডসনের "সু" তে আলো ঠিকরাইতে ছিল। এক পাশে থাটপাতা মেজের কোণে ভাত ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। পাতা বিছানার উপর তাহার পত্রখানি পড়িয়া আছে। মেজেতে চাকরের সাহায্যে ১খানি বিছানা করিয়া সুধাময় বৌদিও ননীকে শোওয়াইল; এবং নিজে পাশের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নিজেও টের পায় নাই; সহসা শেষ রাত্রির দিকে বমির শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি ভ্রাতার ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে গেল। দেখিল দাদা বমি করিয়া ভাসাইয়াছেন বৌদিদি মাথায় জল দিয়া বাতাস দিতেছেন। মদের দুর্গন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে।

সুধাময় কতক্ষণ চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত বলা যায় না, সে ভাবিতেছিল, "এই কি আমার সেই দাদা! যে পানটী খাইতে জানিত না! অমন অধঃপতন হইয়াছে, তাই বৌদিদির কাছে পত্র লিখিতে ভরসা হয় নাই! কিন্তু এই যে সেবাপরায়না অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা নারী এই যে মুখের দিকে চাহিয়া আছে, উদ্বেগের সীমা নাই, চিন্তা নাই, হায়রে পুরুষ দেবতা তুমি, না দেবী ওই নারীটী! তোমার এই পতনে কি ওর ঘৃণা হয় নাই, তবুতে মনি প্রেমে তেমনি স্নেহে তোমাকে আগুলিয়া বসিয়া থাকিবে যুগ যুগ, জন্ম জন্ম।"

মাধুরী বলিল, "ঠাকুরপো, আপনি ঘুমোন্‌গে"। সুধাময় বলিল, "বৌদি, আমি এই নরকে ফেলে দিতে কি তোমায় এনেছি? ভোরের গাড়ীতে তোমাকে কল্‌কাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাই চল, উনি টেরও পাবেন না।"

দাদাকে দাদা বলিতে সুধাময়ের ঘৃণা হইতে ছিল। মাধুরীর বিবর্ণ মুখে একটুখানি হাসি ফুটিল। হাসি ত নয় যেন ঠোঁটের কোনে জমান অশ্রুর নীরব ভঙ্গী ফুটিল! মরি মরি, বেদনা না দিলে কি নারীর নারীত্ব ফোটে! না ঘষিলে কি চন্দনের সুগন্ধ ভোগ করা যায়।

মাধুরী বলিল, "আপনি নরক ভাব্‌চেন, তাই মুখে অমন কথাটা বেরিয়ে